ডিসেম্বর ২০২১

ট্যাকিয়ন

বিজ্ঞানে নোবেল ২০২১
শ্রোডিঙ্গারের সমীকরণ
কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি

ভূমিকম্প ও ডাউকি ফল্ট
ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম
কোয়ান্টাম রিয়েলিটি

tachyonts.com

Everything we call real is made of things that cannot be regarded as real. If quantum mechanics hasn't profoundly shocked you, you haven't understood it yet.

-Neils Bohr

সম্পাদক
কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ

সহ-সম্পাদক
মুসতাভি আসহাব বিহন

ফ্যাক্ট চেকার
রুশলান রহমান দীপ্ত
সিফাত হাসান
রিফাত হাসান

ডিজাইন
আনিকা নাসরিন
তাসমিয়া রহমান
নিশাত তাসনিমা

প্রকাশক
ট্যাকিয়ন

লেখকগণ
ফাইয়াজ বিন শফিক
কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ
মো. মিনহাজুল আবেদিন
হৃদয় হক
আশরাফুল ইসলাম মাহি
রুশলান রহমান দীপ্ত
তাইফ মাহবুব স্বপ্ন
আজমাইন তৌসিক ওয়াসি
মোঃ সিফাত হাসান
মাহফুজ আহম্মেদ মাসুদ
শাকির আহমেদ

আমাদের সাথে যুক্ত হতে
ফেসবুক গ্রুপ https://www.facebook.com/groups/tachyonts
ফেসবুক পেইজ https://www.facebook.com/TachyonTs
ওয়েবসাইট https://tachyonts.com/

যেখানে যা পাবেন

চিকিতসাবিজ্ঞানে নোবেল ... ৫
পারমাণবিক মডেলগুলো ... ৯
আলো কী ... ১৪
পরমাণুর সবচেয়ে নিখুঁত ছবি ... ২০
জেমিনিডস উল্কাবৃষ্টি ... ২২
স্পিন মানে ঘুর্ণন না ... ২৮
কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশান ... ৩১
কোয়ান্টাম মেকানিক্স কোথায় কাজে লাগে? ... ৩৬
কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি ... ৪২
কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বইগুলো ... ৪৮
কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গেলমেন্ট ... ৫০
ডিউটেরিয়াম দিয়ে দ্বি-চির পরীক্ষা ... ৫৫
শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল ও কোয়ান্টাম বাস্তবতা ... ৫৬
ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম ও পাথ ইন্টিগ্রাল ... ৬০
ডেটা সায়েন্স : মেথডলজি ও অ্যাপ্রোচ
কি? কেন? কীভাবে? ... ৬৫
ভূমিকম্প ও ডাউকি ফল্ট ... ৭৬
স্বতাপে উদ্ভাসিত মুখ ... ৮২
প্যারালাল ইউনিভার্স ও অন্যান্য ... ৯২
শ্রোডিঙ্গারের সমীকরণ ... ৯৮

চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল

ফাইয়াজ বিন শফিক

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবসময়ই ঠান্ডা, গরম কিংবা কোনো কিছুর স্পর্শ অনুভব করে থাকি। আর এটা আমাদের কাছে খুবই স্বাভাবিক বলেও মনে হয়। কিন্তু আমাদের নার্ভগুলো ঠিক কীভাবে আমাদের এই অনুভূতিগুলো উপলব্ধি করায়? এই প্রশ্নগুলোরই সমাধান বের করেছেন এবারের মেডিসিনে নোবেল বিজয়ীরা। মেডিসিনে এবারের নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী দু'জন হলেন- ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া সানফ্রান্সিসকো-এর প্রফেসর ডেভিড জুলিয়াস ও হাওয়ার্ড হিউজেজ মেডিকেল ইন্সটিটিউটের গবেষক প্রফেসর অরডেম প্যাটাপোটিয়ান।

ডেভিড জুলিয়াসের কাজ

মরিচ খেলে আমরা যে ঝাল অনুভব করি সেই ঝালের পেছনে দায়ী উপাদানটির নাম হলো- 'ক্যাপসাইসিন'। ডেভিড জুলিয়াস এই ক্যাপসাইসিন ব্যবহার করে আমাদের নার্ভে এমন সেন্সর খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন যা কি না আমাদের ত্বকে গরম কিংবা ঠান্ডার অনুভূতি যোগায়।

গরম আর ঠান্ডা অনুভব করার জন্যও আবার আলাদা আলাদা দু'টো সেন্সর বা সংগ্রাহক আছে। গরমকে অনুভব করতে পারে মূলত- TRPV1। অপরদিকে

মেন্থল বা ঠান্ডাকে অনুভব করে TRPM8।

ডেভিড জুলিয়াস আর অরডেন প্যাটাপোটিয়ান-এর আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত আমরা আমাদের নার্ভাস সিস্টেম সম্পর্কে অনেক কিছুই জানলেও একটা ফান্ডামেন্টাল প্রশ্ন রয়েই গিয়েছিল। আর সেটা হলো- আমাদের নার্ভাস সিস্টেম বাইরের তাপ কিংবা অন্যান্য যান্ত্রিক উদ্দীপনাকে কীভাবে ইলেকট ক্যাল সিগন্যালে রূপান্তরিত করে?

ডেভিড জুলিয়াস ইউনাভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়াতে কর্মরত অবস্থায় এই প্রশ্নের অগ্রগতির একটি সম্ভাবনা খুঁজে পান। আমরা মরিচ খেলে ক্যাপসাইসিন নামক রাসায়নিক যৌগটি ঠিক কীভাবে আমাদের সেই ঝালের অনুভূতি যোগায়- তিনি এটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। ক্যাপসাইসিন যে আমাদের বিশেষ কিছু নার্ভ সেল কে উদ্দীপ্ত করে, এবং এরপর আমরা সেই ঝাল বা যন্ত্রণা অনুভব করি- এটা আমাদের জানা থাকলেও, ক্যাপসাইসিন ঠিক কীভাবে এই কাজটি করে- তা ছিল অজানা।

উদ্দীপনা সংগ্রাহক নিউরনগুলোর যেসব জিন আমাদের তাপ, চাপ, যন্ত্রণা কিংবা অন্যান্য কোনো ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া দেখায়- জুলিয়াস এবং তার সহকর্মীরা সেসব নিয়ে লক্ষাধিক DNA ফ্র্যাগমেন্টের একটি লাইব্রেরি তৈরি করলেন। সেই সাথে তারা একটি হাইপোথিসিস দাঁড় করালেন যে- এই লাইব্রেরি তে এমন একটি DNA ফ্র্যাগমেন্ট থাকবে যেটি কি না ক্যাপসাইসিনের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখানোতে সক্ষম প্রোটিনটিকে এনকোড করবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে তারা একটি জিন খুঁজে পেলেন যেটি কি না কোষগুলোকে ক্যাপসাইসিনের প্রতি সংবেদনশীল করে তুলতে সক্ষম। অর্থাৎ এরই মাধ্যমে

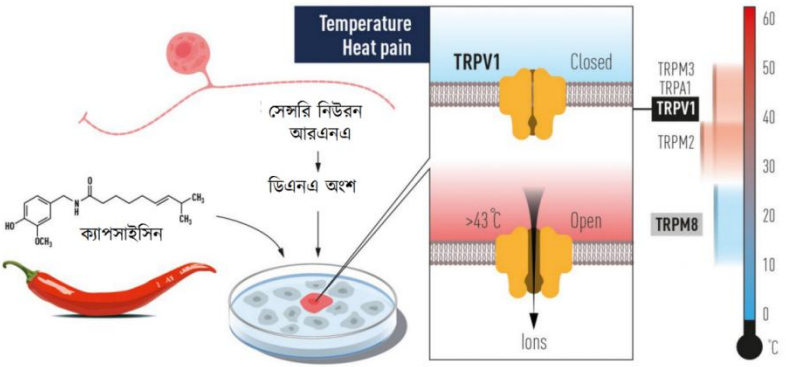

ক্যাপসাইসিনের উদ্দীপনা সংগ্রাহক জিনটিকে খুঁজে বের করা সম্ভব হলো।

পরবর্তীতে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায় যে সেই জিনটি একটি নতুন আয়ন চ্যানেল প্রোটিনকে এনকোড করে এবং নতুন এই ক্যাপসাইসিন রিসেপ্টরটির নাম দেয়া হয়- TRPV1।

এরপরে জুলিয়াস আরো অনুসন্ধান করতে থাকেন যে তাপ এর প্রতি এটি কতটুকু সংবেদনশীল এবং বুঝতে পারেন যে তিনি মূলত যন্ত্রাণাদায়ক তাপীয় উদ্দীপনা সংগ্রাহক একটি রিসেপ্টর আবিষ্কার করেছেন। এর পাশাপাশি আরো বেশ কিছু আয়ন চ্যানেলও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে এবং এর মাধ্যমে এখন আমরা বুঝতে পারি কীভাবে ভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল উৎপন্ন করে।

অরডেন প্যাটাপোটিয়ানের কাজ

তিনি চেষ্টা করেছেন কীভাবে স্পর্শ কিংবা চাপ অথবা এই জাতীয় যান্ত্রিক অনুভূতিগুলো রূপান্তরিত হয়।

প্যাটাপুটিয়ান এবং তার সহকর্মীরা একটি নির্দিষ্ট সেল লাইন খুঁজে পেয়েছেন যেটি কি না পরিমাপযোগ্য ইলেকট্রিক সিগন্যাল পাঠায় যখন কোনো একটি কোষকে 'মাইক্রোপিপেট'-এর সাহায্যে খোঁচা দেয়া হয়।

মাইক্রোপিপেট কী জানেন না? ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত একটি ইন্সট্রুমেন্ট। মাইক্রোলিটার রেঞ্জে কোনো তরল আদান প্রদান এর জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

চিত্র - মাইক্রোপিপেট

সেই সাথে এটিও নিশ্চিত করা হয়েছে যে যান্ত্রিক বলের কারণে যে রিসেপ্টরটি অ্যাক্টিভেট হয়, সেটিও মূলত একটি আয়ন চ্যানেল। পরবর্তীতে ৭২টি জিন এনকোডিং-এ সক্ষম রিসেপ্টর পাওয়া যায়।

এরপর প্রতিটি জিনকে একটি একটি করে ইন-একটিভ করে সেই নির্দিষ্ট জিনটিকে খোঁজার চেষ্টা করা হয় যেটি কি না নির্দিষ্ট কোষগুলোর যান্ত্রিক সংবেদন-শীলতার পেছনে দায়ী। অবশেষে, প্যাটাপুটিয়ান এমন একটি নির্দিষ জিন খুঁজে পান যেটিকে ইন-একটিভ করা হলে, কোষটি সেই মাইক্রোপিপেট/যান্ত্রিক উদ্দীপনার প্রতি আর সংবেদনশীল থাকে না।

অর্থাৎ এই জিনটিই যান্ত্রিক উদ্দীপনার প্রতি সংবেদনশীলতার পেছনে দায়ী।

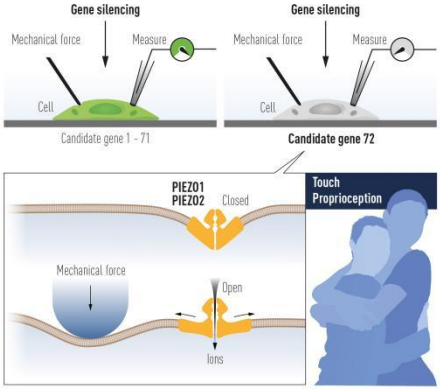

এভাবেই পুরোপুরি অজানা এবং নতুন একটি আয়ন চ্যানেল খুঁজে বের করা সম্ভব হয় যেটি কি না যান্ত্রিক উদ্দীপনার প্রতি সংবেদনশীল এবং এর নাম দেয়া হয়- Piezo1। এরপরে তাঁরা আরো একটি জিন খুঁজে পান এবং সেটির নাম দেন Piezo2।

পরবর্তীতে দেখা যায় যে, Piezo1 এবং Piezo2 এই দুটি আয়ন চ্যানেলই সেল মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লীর উপর চাপ প্রয়োগ করা হলে সরাসরি অ্যাক্টিভেট হয়।

এখানেই শেষ নয়, আরো গবেষণার পর দেখা যায় যে আমাদের শরীরের চলন এবং গতির সংবেদনশীলতার পেছনেও Piezo2-এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূ-মিকা রয়েছে। সেই সাথে Piezo1 এবং Piezo2 রক্তচাপ, শ্বসনের মত কিছু শারীরবৃত্তীয় কাজের নিয়ন্ত্রণে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আমাদের ম্যাগাজিনের পূর্বের সংখ্যাটি
পড়তে ক্লিক করুন

https://cutt.ly/tTC1WEU

পারমাণবিক মডেলগুলো

কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ

প্রাচীন যুগে পদার্থবিজ্ঞান বলতে যা বুঝাতো তা হচ্ছে দর্শন। নিউটনের সময়েও পদার্থবিজ্ঞান বলে কিছু ছিল না। প্রকৃতি নিয়ে দর্শন চর্চাকে ডাকা হতো ন্যাচারাল ফিলোসফি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তি গড়ে তাতে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেন হাসান ইবন হায়সাম। গানিতিক ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে ন্যাচারাল ফিলোসফিতে রীতিমতো যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন আইজ্যাক নিউটন। মানুষের সেই দার্শনিক জ্ঞান থেকেই মানুষ চিন্তা করতে করতে ভাবল আমরা একটি বস্তুকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে কতটুকু ক্ষুদ্র করতে পারি? আমরা কি একটি ইটকে আজীবনই ভেঙ্গে যেতে পারি? না কি এমন একসময় আসবে যখন একে আর ভাঙ্গা যাবে না? এই চিন্তা ধারণা থেকেই গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস সর্বপ্রথম ধারণা দেন, "কোনো পদার্থকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এমন এক অবস্থা আসে যাকে আর ভাঙ্গা যায় না। তিনি এর নাম দেন 'অ্যাটম' (অবিভাজ্য কণা)। বাংলায় একে পরমাণু বলা যায়।" তার এই ধারণা, পরমাণুকে আর ভাঙ্গা যায় না, তবে যেহেতু বিষয়টি দর্শনের তাই তার কথা থেকে বেশি শক্তিশালী কথা হবে প্লেটোর। প্লেটো বললেন, কণা অবিভাজ্য হতে পারে না, বরং সব কিছুকেই চিরকাল ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করা যায়। তার এই মতবাদ চলেছে হাজার বছর।

পরবর্তীতে আসে পদার্থবিজ্ঞানের যুগ, এখানে দর্শন মুখ্য নয়। এই যুগের এক বিজ্ঞানী ডাল্টন। তিনি পরীক্ষালব্ধ তথ্য

থেকে বলেন পরমাণু হচ্ছে অবিভাজ্য। একে আর ভাঙ্গা যায় না।

থমসন মডেল

১৮৯৬ সালে বিজ্ঞানী থমসন পরমানু দেখতে কেমন তার একটি মডেল দেন। বিজ্ঞানী জে. জে. থমসনের দেওয়া এ মডেল অনুসারে পরমাণু দুইটি অংশ নিয়ে গঠিত।

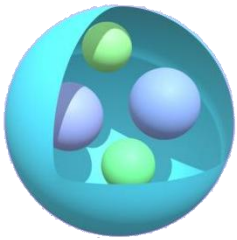

(ক) পজিটিভ অংশ – পরমাণুর কেন্দ্রে পজিটিভ চার্জযুক্ত কিছু আছে।

(খ) নেগেটিভ অংশ – পজিটিভ চার্জের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে নেগেটিভ চার্জের কিছু কণা। এরা এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে যেমনভাবে পুডিং-এর উপরে কিশমিশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এদেরকে ইলেকট্রন বলে।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখো, একটি মডেল কখনো শতভাগ নির্ভুল হয় না। এটি আমাদের প্রাপ্ত উপাত্তকে বুঝ দিতে সাহায্যে করে। পরিসংখ্যানবিদ জর্জ বক্সের মতে, 'সকল মডেলই ভুল। তবে কিছু কিছু মডেল কাজের।' বিজ্ঞানী থমসনের মডেলও আসলে শতভাগ সঠিক না। তার এই মডেলের ভিতর কিছু ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল। ১৯৩২ সালে স্যার জেমস চ্যাডউইক নিউট্রন নামে একটি চার্জহীন কণা আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী থমসনের মডেলে এই নিউট্রন কোথায় রাখা হবে তা নিয়ে কোনো কথা নেই। এটা একটা বড়ো সীমাবদ্ধতা। এটা যেহেতু থমসনের মডেল ব্যাখ্যা করতে পারে না, তাই থমসনের মডেলের বিকল্প মডেল যত দ্রুত খুঁজে বের করতে হবে।

রাদারফোর্ড মডেল

১৯০৯ সালে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড একটি এক্সপেরিমেন্ট করেন। হিলিয়াম পরমাণু থেকে দুইটি ইলেকট্রন সরিয়ে নিলে আলফা কণা নামে একটি কণা পাওয়া যায়। রাদারফোর্ড করলেন কি সেই আলফা কণাকে পাতলা সোনার পাতের মধ্যে দিয়ে একটি ZnS পর্দার উপর নিক্ষেপ করলেন। তিনি দেখলেন ঐ পর্দার উপর সামান্য প্রতিপ্রভা দেখা যায়। এ থেকে তিনি কিছু সিদ্ধান্ত দিলেন।

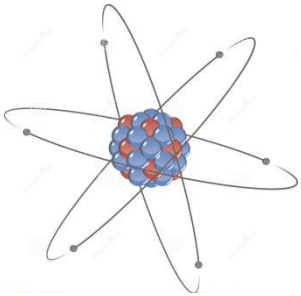

[সিদ্ধান্ত ১] পরমাণুর অধিকাংশ অংশই খালি এবং এর মাঝে পজিটিভ চার্জের একটি নিউক্লিয়াস আছে। এই নিউক্লিয়াসের ভিতরেই থাকে প্রোটন আর নিউট্রন।

[সিদ্ধান্ত ২] পরমাণুর চারপাশে যে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন রয়েছে তারা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে যেমনভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলো ঘুরতে থাকে।

অনান্য সকল মডেলের মতো এরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিজমের উপর দেওয়া তার চারটি সমীকরণের জন্য বিখ্যাত। সেই সমীকরণ মতে একটি ঘুর্ণায়মান চার্জ যদি অপর একটি চার্জকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে তবে ঘুর্ণায়মান চার্জটি শক্তি বিকিরণ করবে। এখন রাদার্ফোর্ড যে বললেন, ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরে তাহলে ইলেকট্রনের তো শক্তি হারানোর কথা। অবিচ্ছিন্নভাবে শক্তি হারালে ইলেকট্রন বৃত্তাকার পথে না ঘুরে সর্পিলাকার পথে ঘুরতে ঘুরতে নিউক্লিয়াসে চলে যাওয়ার কথা এবং ইলেকট্রন আর প্রোটন একে অপরকে নিঃশেষে করে দেওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। তাহলে এই ইলেকট্রনের গতির ব্যাপারে রাদারফোর্ডের মডেল মার খেয়ে গেল। এটা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজন নতুন আরেকটি মডেল।

বোর মডেল

বিজ্ঞানী নিলস বোর হলেন রাদারফোর্ডের শিষ্য। রাদারফোর্ডের মডেল মার খেয়ে যাচ্ছে দেখে বোরের খুব কষ্ট হচ্ছিল। তিনি চিন্তা করলেন যেভাবেই হোক গুরুর মডেল রক্ষা করতে হবে। তিনি বললেন, "ইলেকট্রনগুলো কিছু নির্দিষ্ট (পারমিটেড) কক্ষপথে ঘুরে। এই কক্ষপথে ঘুরার সময় ইলেকট্রন শক্তি গ্রহণও করে না, আবার বিকিরণও করে না। যখনই শক্তি বিকিরণ বা শোষণ করতে চায় তখন এক কক্ষপথ থেকে আরেক কক্ষপথে লাফ দেয়।" এভাবে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিজমের রুলও রক্ষা হলো আর কক্ষপথের ধারণাও আসলো। এই নির্দিষ্ট

কক্ষপথের মডেলটির একটি নতুন নাম দেওয়া হলো, 'বোর মডেল'।

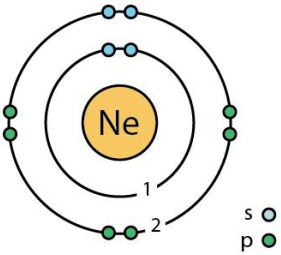

বোর নোবেল প্রাইজও পেলেন। বিজ্ঞানীদের সংবর্ধনা পেলেন। বহু পুরষ্কার অর্জন করে ফেললেন। চারপাশে খ্যাতি আর খ্যাতি। তবে একটা কথা আছে না? জোয়ারের পর ভাটা আসে? বোরের মডেলেও তাই হলো। বোরের মডেল হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য কোনো মৌলের জন্য যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বর্ণালির ব্যাখা দিতে গিয়েও বোর সাহেব গোঁজামিল দেন।

শ্রোডিঞ্জারের মডেল

নিলস বোরের মডেলের এই করূণ দশা দেখে বিজ্ঞানী সমারফিল্ড এগিয়ে এলেন। তিনি দেখালেন, ইলেকট্রন আসলে শুধু বৃত্তাকার পথেই না, উপবৃত্তাকার পথেও ঘুরতে পারে (যখন প্রয়োজন হয়)। তিনি এদেরকে নাম দিলেন অরবিটাল।

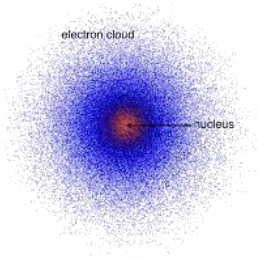

কোয়ান্টাম মেকানিক্স ব্যবহার করে সমারফিল্ড বলেও দিলেন এই অরবিটগুলো দেখতে কেমন হবে। শুধু তাই নয় কিছুদিন আগে বিজ্ঞানী ডি ব্রিগলি দেখিয়েছেন, যাহা কণার ধর্ম লালন করে তাহা তরঙ্গ ধর্মও লালন করে। এবার শোডিঞ্জার সাহেবের সমীকরণ ব্যবহার করে, সমারফিল্ড সাহেব জানালেন, অরবিটাল আসলে মেঘের মত। এদের ঠিক কোন জায়গায় কখন ইলেকট্রন থাকবে তা নিশ্চিতভাবে বের করা সম্ভব নয়। যেহেতু এতে সবচেয়ে বেশি কাজে লেগেছে শোডিঞ্জারের সমীকরণ, তাই এই মডেল তারই নামে।

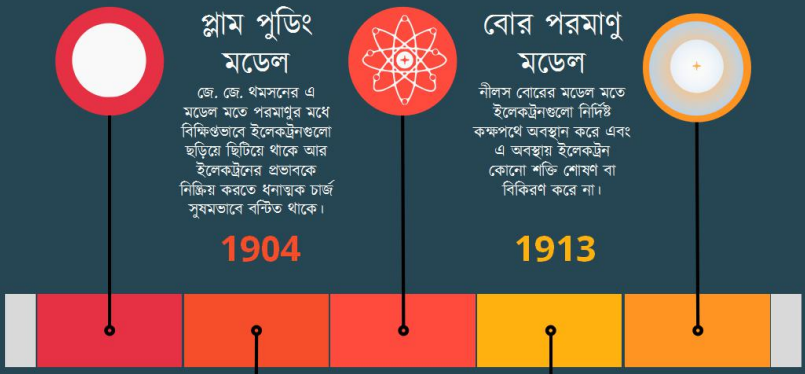

1803

ডাল্টনের মডেল

জন ডালটনের এ মডেল মতে সকল বস্তু এক ধরণের অবিভাজ্য কণা দ্বারা গঠিত। এ কণাকে পরমাণু বলে। ডালটনের এ পরমাণুর মডেল গ্রিক দর্শন থেকে অনুপ্রাণিত ছিল।

1904

প্লাম পুডিং মডেল

জে. জে. থমসনের এ মডেল মতে পরমাণুর মধে বিক্ষিপ্তভাবে ইলেকট্রনগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে আর ইলেকট্রনের প্রভাবকে নিষ্ক্রিয় করতে ধনাত্মক চার্জ সুষমভাবে বন্টিত থাকে।

1911

সৌর কেন্দ্রিক মডেল

আলফা কণা বিক্ষেপণের মাধ্যমে রাদারফোর্ড বলেন, পরমাণুর কেন্দ্রে ধনাত্মক চার্জের নিউক্লিয়াস থাকে ও তাকে কেন্দ্র করে ঋণাত্মক চার্জের ইলেকট্রন ঘুরে।

1913

বোর পরমাণু মডেল

নীলস বোরের মডেল মতে ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট কক্ষপথে অবস্থান করে এবং এ অবস্থায় ইলেকট্রন কোনো শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করে না।

1926

কোয়ান্টাম মডেল

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা এ মডেল মতে, ইলেকট্রন অরবিটে অবস্থান করে বলে আমরা বলতে পারি না। বরং ইলেকট্রন, ইলেকট্রন মেঘে অবস্থান করে।

ট্যকিয়ন

আলো কী?

মো. মিনহাজুল আবেদিন

আলো কী? প্রশ্নটা করা হলে মোটামুটি সবাই উদগ্রীব হয়ে যাবো উত্তর দেবার জন্য। আমরা যারা একটু-আধটু বিজ্ঞান পড়েছি তারা বোধহয় চট করে উত্তর দিয়ে দেবো যে আলো হলো একপ্রকার শক্তি যা আমাদের দর্শনানুভূতির জন্ম দেয়। সংজ্ঞাটা যে সঠিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সংজ্ঞা থেকে আলোর প্রকৃতিটা ঠিক অনুভব করা যাচ্ছে না।

যারা বিজ্ঞানটাকে একটু বিস্তৃতভাবে পড়েছি তারা হয়তো বলবো যে আলো এক প্রকার তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ যার বেগ সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার। এবার আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া গেল। আলো একপ্রকার তরঙ্গ। কিন্তু আলো মাঝে মাঝে কণার মতোও আচরণ করে বলে পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া যায়। তাহলে আলোকে শুধু তরঙ্গ বলাও ভুল হচ্ছে। তাহলে আলো আসলে কী?

একশো বছর আগে ঠিক এই প্রশ্নটাই পাগল করে তুলেছিল এক ফরাসি যুবককে। আলো যে এক প্রকার তরঙ্গ সেটার পক্ষে যথেষ্ঠ প্রমাণ আছে। যেমন আলোর ব্যতিচার *(Interference)* ধর্ম। সমান তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দুটো আলোকরশ্মি পরস্পর বিপরীত দিক মিলিত হলে মিলনস্থলে কিছু কিছু অঞ্চলে কোনো আলোই দেখা যায় না। আবার একই দিক থেকে তারা মিলিত হলে স্থানে স্থানে উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দেখা যায়। অনেকটা স্থির পানিতে সমান ভর এবং আয়তনের দুটো পাথরখন্ড ভিন্ন দুটো

জায়গায় ফেললে যে দৃশ্যপটের অবতারণা হয়, সেরকম। আলোর এধরনের ঘটনাকে বলা হয় ব্যতিচার এবং এটা প্রমাণ করে যে আলো একপ্রকার তরঙ্গ বৈ কিছু নয়। কিন্তু আলোর আরো একটা প্রতিষ্ঠিত ধর্ম হলো আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া। যে ক্রিয়া সংঘটনের নীতি ব্যাখ্যা করে ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন মহামতি পদার্থবিদ অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

কোনো ধাতব পাতের ওপর উপযুক্ত কম্পাঙ্কের আলোকরশ্মি ফেলা হলে পাত থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। এটাই আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া *(Photoelectric effect)*. আলোর এ ধর্মটি প্রমাণ করে যে আলো আসলে কণা।

তাহলে আসলে ঘটছে টা কি? উত্তর খুঁজতে লেগে পড়েন সেই যুবক। শুরু হলো তার নিজস্ব গবেষণা। ১৯২৪ সালে সেই গবেষণাকর্ম তিনি প্রকাশ করেন তাই পিএইচডি থিসিস পেপারে। পদার্থবিদ ল্যাভেংডিনের হাত ঘুরে সেই থিসিস পেপার পৌঁছে যায় মহামতি আইস্টাইনের হাতে। আইনস্টাইন যুবকের গবেষণাকর্মকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তার মতের সাথে সহমত পোষণ করেন। সে গবেষণার ফলাফলটা ছিল ভয়ঙ্কর! আর তা হলো যে শুধু আলোই নয় বরং কোয়ান্টাম জগতে অবস্থিত গতিশীল সকল জিনিসই একইসাথে কণা এবং তরঙ্গ দুটোই! সেই অনুকল্পে (*Hypothesis*) তিনি একটা সমীকরণ প্রস্তাব করেন,

$$\lambda = h/p$$

যেখানে λ হলো গতিশীল কণার তরঙ্গদৈর্ঘ্য। h হলো প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক যার মান 6.63×10^{-34} Js এবং p হলো গতিশীল কণার ভরবেগ।

সমীকরণে তরঙ্গদৈর্ঘ্য রাশিটির উপস্থিতি প্রমাণ করে যে গতিশীল বস্তুর তরঙ্গধর্ম বিদ্যমান। আবার ভর রাশিটির (যেহেতু $p = mv$) উপস্থিতি গতিশীল তরঙ্গের কণাধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ এ সমীকরণ অনুযায়ী সকল কণারই তরঙ্গধর্ম আছে এবং সকল তরঙ্গেরই কণাধর্ম রয়েছে। তবে বস্তুটি যদি প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম জগতের চেয়ে অনেক বড়ো হয় (যেমন একটা টেনিস বল) তবে এ তরঙ্গদৈর্ঘ্য শনাক্ত করা যায় না।

সচেতন পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই সমীকরণটি দেখামাত্র সেই ফরাসি যুবককে চিনে ফেলেছেন? হ্যাঁ, তিনি হলেন বিখ্যাত কোয়ান্টাম পদার্থবিদ ল্যুই ডি ব্রগলি। উদ্ধৃত সমীকরণটি তার নামানুসারে ডি ব্রগলি সমীকরণ নামে পরিচিত।

তবে কোয়ান্টাম ফিজিক্স পড়ার সময় একটা প্রশ্ন কমবেশি সবার মনেই উঁকি দেয় যে "ফোটন যদি ভরহীন কণিকাই হবে তবে এর ভরবেগ থাকে কীভাবে?" আসলে আলোর তরঙ্গতত্ত্ব (*electro-magnetic wave*) অনুসারে আলো ভরহীন। কিন্তু ডি ব্রগলির সমীকরণে আলোকে ভরহীন বিবেচনা করা হয়নি। তবে ভরের যে রাশিটি ডি ব্রগলি তার সমীকরণে ব্যবহার করেছেন তা বস্তুকণার স্থির অবস্থার ভরবেগ (*Static momentum* m_0v) নয় বরং আইন্সটাইনের থিয়োরি অব স্পেশাল রিলেটিভিটিতে বর্ণিত গতিশীল বস্তুকণার আপেক্ষিক তত্ত্বীয় ভরবেগ (*Relativistic momentum*)!

আপেক্ষিক তত্ত্বীয় ভর p এবং স্থির অবস্থার ভর p_0 এর মধ্যকার সম্পর্কটি নিম্নরূপ :

$$p = \frac{p_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

যেখানে v হলো বস্তুকণার বেগ এবং c হলো আলোর বেগ (ধ্রুবক)।

আদি ধারণা মতে ফোটন কণার স্থির অবস্থায় ভর শুন্য। তবে সাম্প্রতিক এক গবেষণা অনুযায়ী স্থির অবস্থার ফোটন একেবারে শূন্য ভরের নয়! [1] ফোটন যখন কোনো বস্তুর উপরিভাগের (*surface*) সংস্পর্শে আসে তখন গাণিতিকভাবে এর ভর একটি জটিল সংখ্যা হয়। এই ভর নির্ভর করে উপরিভাগের দিকনিরপেক্ষ বক্রতা এবং ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর। আর ফোটন এরূপ ভরবিশিষ্ট হওয়ার ভ্রম তৈরি করে কেবল কণা-তরঙ্গ দ্বৈততার জন্যই। সাম্প্রতিক এই পরীক্ষণ অনুযায়ী স্থির ফোটনের অনুমিত ভর হলো 10^{-54} kg। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার তো এটা যে আমরা কখনোই এই কণা-তরঙ্গ দ্বৈততা একত্রে দেখতে পাবো না।

টমাস ইয়ং ১৮০১ সালে তার বিখ্যাত দ্বি-চির পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে আলো একটা তরঙ্গ। কিন্তু অনেক পরে তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাপ করার জন্য যখন ডিটেক্টর বসানো হলো তখনই বাধলো গণ্ডগোল। কারণ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে যখনই ডিটেক্টর ব্যবহার করা হয় তখনই আলো কণার মতো আচরণ করে। আবার যখনই

ডিটেক্টর সরিয়ে ফেলা হয় তখনই আলো আবার তরঙ্গের মতো আচরণ শুরু করে দেয়। আলো ঠিক কেনো এমনটা করে সেটা আজও একটা অমীমাংসিত রহস্য।

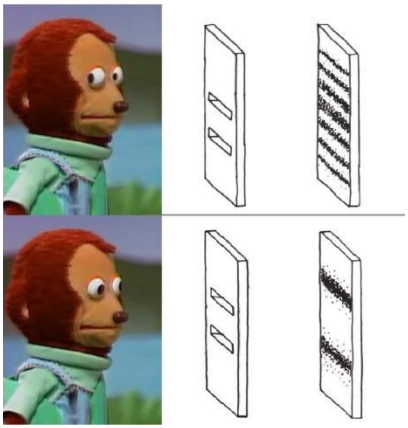

ডিটেক্টর ছাড়া ফোটন তরঙ্গের মতো আচরণ করে। কিন্তু ডিটেক্টর দিয়ে পর্যবেক্ষণের সময় ফোটন কণার মতো আচরণ করে। (সোর্স - অজানা)

তবে আলো যে কারণেই এরকমটা করুক না কেনো দ্বি-চির পরীক্ষা প্রমাণ করে দিয়েছে যে আলো সত্যিই একই সাথে কণা এবং তরঙ্গ। আজ আমরা সবাই মেনে নিয়েছি যে আলো সবসময় দুটো আইডি কার্ড নিয়ে ঘোরাফেরা করে। একটা তরঙ্গের আর একটা কণার। যেখানে তরঙ্গধর্ম দেখানোর প্রয়োজন পড়ে সেখানে তরঙ্গ-কার্ড দেখায় আর কণা-কার্ড দেখিয়ে প্রবেশ করে কণাদের গোত্রে।

ফোটন একই সাথে কণা ও তরঙ্গের মত আচরণ করে। তাই এটি একই সাথে দুইটি আইডি কার্ড নিয়ে ঘুরে। (সোর্স - অজানা)

যেমন প্রতিসরণের ঘটনায় অংশ নিতে গিয়ে আলোকে তার তরঙ্গ-কার্ড দেখাতে হয়। চলার পথে আলোক রশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করলে নিজের গতিপথ পরিবর্তন করে নেয়। এ ঘটনাকে বলা হয় আলোর প্রতিসরণ। যে আলোক মাধ্যমের আলোকীয় ঘনত্ব বেশি সে মাধ্যমে আলো তুলনামূলক ধীরে চলে। আসলে আলো তার গড় বেগকে ধ্রুব রাখতেই একটু বেঁকে গিয়ে অপেক্ষাকৃত কম দূরত্ব অতিক্রম করে পুনরায় মাধ্যম থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু ঠিক কি কারণে আলোক-ঘন মাধ্যমে আলোর বেগ কমে যায় তার সবচেয়ে

সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে হলে আলোকে তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। ব্যাখ্যাটা হলো যে যেহেতু আলো একটি তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ কাজেই আলোর বৈদ্যুতিক তরঙ্গের একটা নিজস্ব তড়িৎক্ষেত্র থাকে। তাই আলোক তরঙ্গ বস্তু স্থিত ইলেকট্রনের তড়িৎক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। তখন আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে যায় বলে আলোর বেগও হ্রাস পায়। আবার যখন আলো ওই বস্তু (আলোক-ঘন মাধ্যম) পেরিয়ে আসে তখন আর তড়িৎক্ষেত্রকে প্রভাবিত করার মতো কিছু থাকে না। তখন আলো আবার তার নিজস্ব বেগ ($c = 3\times10^8\ m/s^2$) নিয়ে চলতে থাকে। [2]

আবার কৃষ্ণগহ্বরের কাছে গিয়ে আলো তার কণা-কার্ড দেখায়। কৃষ্ণগহ্বর স্থানকালকে এমনভাবে বাঁকিয়ে দেয় যে এর কেন্দ্র থেকে শুরু করে ব্যাসার্ধ বরাবর একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত (ঘটনা দিগন্ত বা *event horizon*) কিছুই মুক্তি পায় না। এ বক্রতা ঘটনা দিগন্তের ভেতর এতটাই বেশি যে একবার যেটা (হোক না সে আলোর কণা) ঘটনা দিগন্তের ভেতর প্রবেশ করে তা আর কখনোই বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। কারণ কৃষ্ণগহ্বরের মুক্তিবেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশি। এ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে হলে আলোকে আর তরঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করলে চলে না। তখন আলোকে অবশ্যই কণা হিসেবে বিবেচনা করতে হয়। কারণ স্থানকালের বক্রতা তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে না। [3] যদিও সম্প্রতি এক রিসার্চ পেপারে ডক্টর অলগ্রিডাস ম্যাকনিকাস দেখিয়েছেন যে বিষয়টি আসলে তা নয় বরং স্থানকাল কর্তৃক তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের ওপর সরাসরি প্রভাব বিদ্যমান [A]। [4]

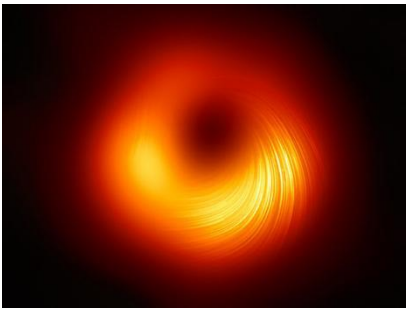

ব্ল্যাকহোলের প্রভাবে তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের বেঁকে যাওয়ার ঘটনার ছবি তোলা হয় ২০২১ সালে। (সোর্স - ইউরোপিয়ান স্পেস অ্যাজেন্সি)

একটা সময় ছিল যখন আমরা ভাবতাম যে বিজ্ঞান সর্বদা সঠিকতম তথ্যটাই জানায়। যেমন একটি ফুটবলের ঠিক কোন স্থানে? কত কোণে? কত বলে

[A] এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন https://cutt.ly/3TNjDQN

(*force*)? কিক করলে বলটি (*ball*) ঠিক কতক্ষণ পরে? কোথায় গিয়ে পড়বে? তা নিউটনীয় বলবিদ্যার সাহায্যে একদম ঠিকঠাক ভাবে বলে দেয়া সম্ভব। আমরা ভাবতাম যে এভাবে জানতে জানতে একদিন আমরা সম্পূর্ণ প্রকৃতিটাকেই বুঝে ফেলবো। কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রমাণ করে দিয়েছে যে প্রকৃতি কখনোই তার সম্পূর্ণ রহস্যকে আমাদের সামনে খোলাসা করবে না। কোয়ান্টাম জগতে গিয়ে আমরা আর বলতে পারি না যে 'হবে' বরং আমাদেরকে বলতে হয় যে 'হতে পারে'। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি নেই। কারণ রহস্যময় বলেই প্রকৃতি এত সুন্দর। [5]

তথ্যসূত্র

[1] *Results in Physics, Volume 16, March 2020, 102866*
[2] *Dr. Don Lincoln, Fermilab; The official YouTube channel of Fermi National Accelerator Laboratory*
[3] *Albert Einstein, Theory of General Relativity, 1916*
[4] *Journal of Modern Physics, Vol. 4 No. 8A, August 2013 AD*
[5] মুহম্মদ জাফর ইকবাল, কোয়ান্টাম মেকানিক্স

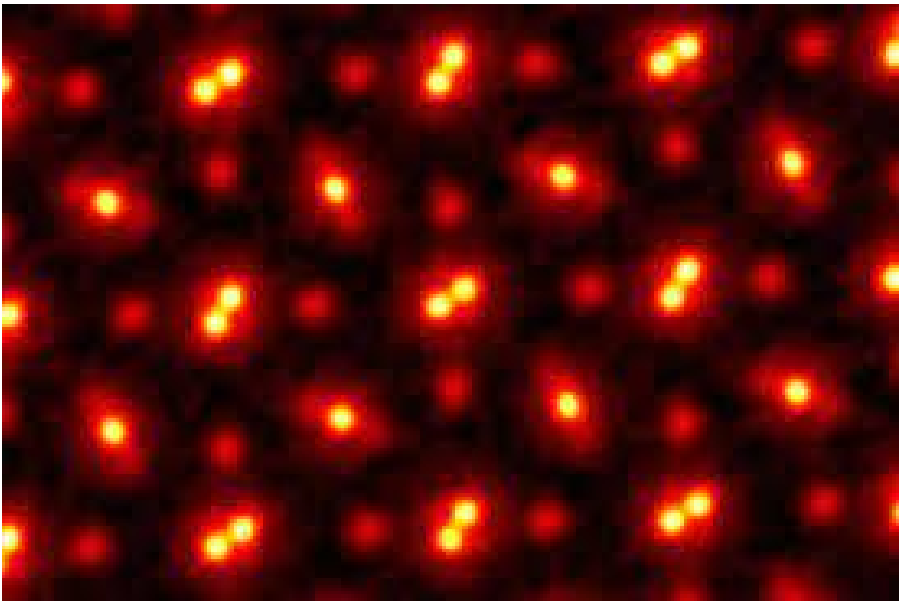

পরমাণুর সবচেয়ে নিখুঁত ছবি

কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ

পরমাণুর কথা নতুন নয়। সেই গ্রীক দার্শনিকের চিন্তা থেকে জন্মেছিল এমন এক কণার কথা যা আর ভাঙ্গা সম্ভব নয়। এমন কণাকেই তারা নাম দিয়েছিল এটম। বাংলায় আমরা একে জানি পরমানু নামে। তবে আমরা বর্তমানে জানি পরমানু আসলে অবিভাজ্য না। একেও আরো ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। পরমাণুর প্রধান তিনটি ভাগ হচ্ছে এর কেন্দ্রে থাকা প্রোটন ও নিউট্রন। আর কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরতে থাকা ইলেকট্রন। তবে এসবই আমরা জানতাম কিছু পরীক্ষার ফলাফল হিসেবে। গত কয়েকদশক আগেই কেবল ছবিতোলার মাধ্যমে আমরা দেখতে পেরেছি পরমানুকে। এখনো সরাসরি ইলেকট্রন, প্রোটন কিংবা নিউট্রনের ছবি তোলা সম্ভব হয়নি। তবে পরমাণুর সেই ছবিটি ছিল অস্পষ্ট! তবে এবার তোলার হয়েছে বেশ স্পষ্ট একটি ছবি।

কীভাবে তোলা হলো ছবিটি?

কর্নেল ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক পরমাণুর এই ছবি তোলার কাজটি করেন। তারা ইলেকট্রনের একটি বিম একটি বস্তুতে ছুড়ে মারেন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বস্তু হিসেবে *praseodymium ortho-scandate* ($PrScO_3$) ক্রিস্টালকে ব্যবহার করেন। সেই ইলেকট্রনের বিম পরমাণুর সাথে ক্রিয়া করে দিক পরিবর্তন করে। ইলেকট্রনের এ পরিবর্তিত দিক ধরার জন্য থাকে একটি ডিটেক্টর। ইলেকট্রনের এই গতিপথ দেখেই বের করা পরমাণুর চিত্র। এই পদ্ধতির নাম ইলেকট্রন টাইকোগ্রাফি। এর সাহায্যে প্রায় ১০০ মিলিয়ন গুণ বড় করে ছবিটি তোলা হয়েছে। (সায়েন্টিফিক আমেরিকান অবলম্বনে)

জেমিনিডস উল্কাবৃষ্টি

হৃদয় হক

জেমিনিডস উল্কাবৃষ্টি নিয়ে প্রথম হদিস মেলে সম্ভবত ১৮৩০ দশকে। তখন দুটো রিপোর্ট পাওয়া যায় এ নিয়ে। তারমধ্যে প্রথমটি আসে জ্যোতির্বিদ *L. F. Kämutz* থেকে। তিনি ১৮৩০ সালের ডিসেম্বর মাসের ১২/১৩ তারিখ কম সময়ের মধ্যে ৪০টির মতো উল্কা দেখার কথা জানান।

১৮৪০ দশকেও এদের নিয়ে কয়েকটি রিপোর্ট আসতে দেখা যায়। ১৮৪৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর রাতে জ্যোতির্বিদ *E. J. Lowe* রিপোর্টে লেখেন, *"Many falling stars noticed in the constellations Orion, Taurus, Gemini, and Auriga."*

১৮৫০ দশকের দিকে এই উল্কাবৃষ্টিকে ভালোই অ্যাকটিভ থাকে দেখা যায়। অফিশিয়াল ভাবে, এটি যে বার্ষিক উল্কাবৃষ্টি সেটি সবার আগে ১৮৬২ সালে *B. V. Marsh* নামের একজন জ্যোতির্বিদ বুঝতে পারেন। শুধু তাই না, তিনি এই উল্কাবৃষ্টির রেডিয়ান্ট বিন্দু যে মিথুন রাশির বিষ্ণু *(Castor)* এবং সোমতারার *(Pollux)* আশেপাশে অবস্থিত সেটিও লক্ষ্য করেন। কিন্তু একই সময়ে জ্যোতির্বিদ *R. P. Greg*-ও স্বাধীনভাবে এই উল্কাবৃষ্টি আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি এই উল্কাবৃষ্টির রেডিয়ান্ট হিসেবে মিথুন রাশির বিষ্ণুতারা (*Castor*) এবং আগিরা মণ্ডলের উরঃ (*Menkalinan*) তারার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে নির্ধারণ করেন। তবে উল্কাবৃষ্টিটির রেডিয়ান্ট আরো সঠিকভাবে সর্বপ্রথম নির্ধারণ করেন জ্যোতির্বিদ *A. S. Hershel*। তিনি বলেন, বেশিরভাগই

বিষ্ণুতারার নিকট থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

পরবর্তীতে একে নিয়ে আরো পর্যবেক্ষণ হয় এবং ১৯৮৯ সালে আই.এম.ও. (IMO) বা *"The International Meteor Organization"* এর ZHR* বের করেন। তা হলো, ঘন্টায় ৫০ থেকে ১২০টি। বলা বাহুল্য, আই.এম.ও. গঠিত হয়েছিল ১৯৮৮ সালে এবং উক্ত সালেই সেখানকার সদস্যবৃন্দরা মিলে ১৪,১৯৩টি জেমিনিডস উল্কা দেখেছিলেন। আর প্রতিবছর এই উল্কাবৃষ্টির ZHR বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই উল্কাবৃষ্টির জননী হলো, ১৯৮৩ সালে আবিষ্কৃত *"3200 Phaethon"* নামের একটি গ্রহাণু। হ্যাঁ, ধূমকেতু না গ্রহাণু। ব্যাপারটি নিয়ে জ্যোতির্বিদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। কোনো জ্যোতির্বিদ বলতেন এটা ধূমকেতু, তো অন্য জ্যোতির্বিদরা বলতেন এটা গ্রহাণু। পরিশেষে দেখা যায়, এটি বর্তমানে একটি গ্রহাণু তবে, এরমধ্যে ধূমকেতুর কিছু বৈশিষ্ট্য এখনও বিদ্যমান। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এটি এককালে ধূমকেতু ছিল। তবে আজ সর্বহারা হয়ে একশ্রেণির গ্রহাণুতে পরিণত হয়েছে। গ্রহাণুটির বার্ষিক গতি মাত্র প্রায় ১.৪ বছর। এটি আবিষ্কারের আগে মনেকরা হতো, প্রতিটি উল্কাবৃষ্টিই ধূমকেতুর কক্ষপথের সাথে জড়িত এবং এসব ধূমকেতুর কক্ষপথ বেশ বড়ো হত। অর্থাৎ বার্ষিক গতি অনেক বেশি হত। কিন্তু এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীদের এই ধারণা পাল্টে যায়। ফলে এই আবিষ্কারটি ধূমকেতুর সাথে উল্কাবৃষ্টির সম্পর্ক আবিষ্কারের মতোই একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

যাহোক, বর্তমানে এই বার্ষিক উল্কাবৃষ্টির সময়সীমা ৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। তবে ১৩ই ডিসেম্বর রাত থেকে ১৪ই ডিসেম্বর ভোরবেলা পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি উল্কার দেখা মেলে। এটা হলো এই উল্কাবৃষ্টির পিক টাইম।

এই উল্কাবৃষ্টির রেডিয়ান্ট বিন্দু হল বিষ্ণুতারার (*Castor*) ১° উপরেই এবং তা বের করাও সহজ। আমাদের ছায়াপথে এর অবস্থানের ফলে, এই উল্কাবৃষ্টির উল্কাগুলোর উজ্জ্বলতা কেমন হবে তার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রাতের আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হল লুব্ধক (*Sirius*), অনেক উল্কাই এর মতো উজ্জ্বল হবে। অনেকেই আবার কালপুরুষ মণ্ডলের বাণরাজা (*Rigel*) তারার মতো উজ্জ্বল হবে। তবে

বেশিরভাগই এদের চেয়ে কম উজ্জ্বল হবে। আর উল্কাগুলো হবে হলুদ, নীল, লাল অথবা সবুজ রঙে রাঙা!

মিথুন : দুই ভাইয়ের ইতিকথা

গ্রিক পুরাণে, মিথুন রাশির এ দুই ভাইকে স্বর্ণমেষের চামড়ার সন্ধানে বা আর্গোনটদের দুঃসাহসিক অভিযানে এবং তাদের বোন হেলেনকে উদ্ধার করতে দেখা যায়। তবে সেখানে তাদের ভূমিকা সাধারণ এবং তারামণ্ডলের সাথে ঠিক যায় না। তারা মূলত বিখ্যাত তাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের, বিশেষ করে, ক্যাস্টরের মৃত্যুতে পোলাক্সের ভ্রাতৃত্ববোধের জন্য। গল্পটি তারামণ্ডলের সাথেও যায়। ফলে, এখানে সেই গল্পটাই জানাবো।

বলা বাহুল্য, আর্গোনটদের দুঃসাহসিক অভিযানের সাথে, মিথুনসহ আকাশের বেশকটি তারামণ্ডল জড়িয়ে আছে এবং গল্পটি বিশাল। আর আমরা যেহেতু ভ্রাতৃত্ববোধের গল্পটি জানবো, সেখানে মিথুনের সাথে শুধু বকমণ্ডল জড়িত।

সুন্দরী লিডা ছিল স্পার্টার রাজা টিন্ডারিয়াসের স্ত্রী। লিডা তার স্বামীর প্রতি অনুরাগী ছিল। দেবরাজ জিউস লিডার প্রেমে পড়ে এবং তিনি এই ব্যাপারটা জানতেন। তিনি বুঝতে পারেন, লিডাকে পটানো সহজ কাজ হবে না। জিউস এও জানতেন, লিডা পশুপাখিদের ভালোবাসতো এবং তাদের প্রতি সর্বদা দয়ালু ছিল। তাই তিনি একটা ফন্দি আঁটলেন।

জিউসের একটা ঈগল ছি। জিউস নিজের রূপ পাল্টে খুবই সুন্দর এবং সাদা রঙের একটি হাঁসের রূপ ধারণ করেন। তারপর লিডার উপরে ঈগলকে দিয়ে রাজহাঁসরূপে নিজেকে ধাওয়া করিয়ে লিডার মনোযোগ কাড়ে এবং আহত হবার নাটক করে লিডার আশেপাশে পতিত হয়। এই হাঁসটি আকাশের *Cygnus* তারামণ্ডল বাংলায় বকমণ্ডল।

লিডা দ্রুত হাঁসটির নিকট ছুটে যায়। ঈগলকে তাড়িয়ে দেয় এবং হাঁসটির প্রতি যত্নশীল হয়। হাঁসরূপি জিউসের ভাঙা পাখা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত সে লিডার খুব নিকটে বেশ স্নেহেই ছিল। পরবর্তীতে নিজের অজান্তেই টিন্ডারিয়াসের দুই সন্তান—ক্যাস্টর ও ক্লাইটেমিনিস্ট্রা'র সাথে জন্ম দেয় জিউসের দুই সন্তান—পোলাক্স ও হেলেনকে। তা সত্ত্বেও উভয় ভাইকেই (পোলাক্স ও ক্যাস্টর) অনেক সময়

জিউসের সন্তান ধরা হয়। তারা তাদের গ্রিক নাম ডিসকোউরীতে (জিউসের সন্তানগণ) বিখ্যাত। তবে এই চারজনেরই পরবর্তীতে গ্রিক পুরাণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

ছোটো থেকেই পোলাক্স এবং ক্যাস্টর ছিল অবিভাজ্য। বড়ো হয়ে পোলাক্স হয়ে ওঠে মুষ্টিযোদ্ধা এবং ক্যাস্টর হয়ে ওঠে অশ্বারোহী। তারা আবার তাদের জমজ কাজিন ইডাস ও লিনসিয়াসের সাথেও বেশ ভালো বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। এই দুজন কাজিন আবার তাদের সাথে স্বর্ণমেষের চামড়ার সন্ধানে বা আর্গোনটদের দুঃসাহসিক অভিযানেও সঙ্গ দেয়। কিন্তু তাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরে যখন মিথুন ভাইগণ এই দুই কাজিনদের হবু বউদের অপহরণ করে নিজেরাই বিয়ে করে ফেলে। পরে এক গবাদিপশুর পালে হানা দেবার জন্য তাদের মাঝে এই ফাটল সাময়িক সময়ের জন্য মিটিয়ে নেয়।

হানা শেষে আসে ভাগ-বণ্টনের ব্যাপার। দায়িত্ব পড়লো ইডাসের উপর। ইডাস একটি মাংসকে চারভাগ করলের এবং যার ভাগ আগে খেয়ে শেষ করতে পারবে, সেই গবাদিপশুর অর্ধেক পাবে। আর বাদবাকি সব পাবে খেয়ে শেষ করা দ্বিতীয় জন। মাংসটি যখন ভাগ করা হচ্ছিল এবং অন্যদের খাওয়া শুরু করার আগেই ইডাস তার ভাগটি শেষ করে ফেলে এবং মিথুন ভাইদের আগে লিনসিয়াসের ভাগটি শেষ করতে সাহায্য করে।

প্রতারিত বোধে কাজিনদের অনুপস্থিতিতে মিথুন ভাইয়েরা সবগুলো পশু চুরি করে নিয়ে যায়। পরে যখন মিথুন ভাইয়েরা জানতে পারে তাদের কাজিনরা ফিরে এসেছে এবং প্রতিশোধের জন্য ফন্দি আঁটছে তখন তারা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আঘাতের পরিকল্পনা করে। কিন্তু তা লিনসিয়াসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায়নি। তারপর তাদের মাঝে যুদ্ধ লেগে যায়। যুদ্ধে ক্যাস্টর ও লিনসিয়াস মারা যায় এবং পোলাক্স গুরুতর আহত হয়। ইডাস পোলাক্সকে মেরে ফেলার আগেই জিউস সেখানে উপস্থিত হন এবং বিজলী ছুড়ে ইডাসকে মেরে তার পুত্র পোলাক্সকে উদ্ধার করেন।

জিউসের পুত্র হবার সুবাদে পোলাক্স ছিল প্রকৃতপক্ষে অমর। কিন্তু ভাইকে ছাড়া সে বাঁচতে চায় না। তাই সে জিউসের কাছে ক্যাস্টরের জীবন ফিরিয়ে দিতে কিংবা তাকে ক্যাস্টরের

সাথে পাতালপুরীতে যোগ দাওয়ার অনুরোধ করে।

পাতালপুরী দেখাশোনা এবং মৃতদের উপর রাজত্ব পরিচালনা করতো জিউসের ভাই হেডিস। সেখান থেকে ক্যাস্টরের জীবন ফিরিয়ে আনা জিউসের পক্ষে ছিল অসম্ভব। তবে জিউস তাদের দুই ভাইকে একত্রে থাকার এক বিহিত করে দেন। আর তা হলো, এদের দুইজনের অর্ধেক সময় কাটবে স্বর্গে এবং বাকি অর্ধেক সময় কাটবে পাতালপুরীতে।

আর তাই, আমরা এই দুই ভাইকে আকাশে দেখি — একত্রে, একে অপরের হাত ধরে রাখতে, যেন তারা বিছিন্ন না হয়ে যায়। আর রাতের আকাশে দেখি, প্রায় বছরের অর্ধেক এবং বাকি অর্ধেক থাকে পৃথিবীর নিচে, পাতালপুরীতে।

আকাশ পটে মিথুন রাশি

তারা দেখার জন্য শীতকাল সেরা একটি সময়। আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে, সাথে আঁধার নেমে আসে তাড়াতাড়ি। ফলে, তারা দেখার সময়ও হয় বেশি। মিথুন মণ্ডলটি শীতকালের মন্ডল। রাতের আকাশে সবচেয়ে জনপ্রিয় তারামণ্ডল হলো কালপুরুষ। কালপুরুষকে পাওয়ার পর মিথুন কে সহজেই পাওয়া যায়।

রাত ৮:৩০ বা ৯টা থেকে এই উল্কাবৃষ্টি দেখা শুরু করা যায়। কালপুরুষ তখন থাকবে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের তুলনামূলক পূর্বে। সময় যত গড়াবে, কালপুরুষ আস্তে আস্তে আসবে ঠিক দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং ১২টার দিকে থাকবে দক্ষিণের দিগন্তের বেশখানিকটা উপরে। ১২টার পর সময় যত গড়াবে, কালপুরুষ যেতে থাকবে দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ভোর হবার সময়ের ভেতর পশ্চিম দিগন্ত ছুই ছুই অবস্থানে চলে যাবে।

রাত ১২টার পর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মুখ করে দাড়ালে, দক্ষিণের দিগন্তের বেশখানিকটা উপরে বা ডান দিকে উপরে তাকালেই দেখবেন, ৩টি প্রায় একই রকমের উজ্জ্বল তারা একই সরল রেখার অবস্থান করছে। এটিই কালপুরুষের বিশেষত্ব। অন্য কোথাও এভাবে ৩টি তারা একই সরলরেখায় এত সহজে ধরা দেয় না। গ্রামের ভাষায় এদের বলা হয় তিন তারা। এখানে কালপুরুষের কোমড়ের বেষ্টনী কল্পনা করা হয়। এ তিন তারার, মধ্যখানের তারাটির নাম অনিরুদ্ধ *(Alnilam)* অনিরুদ্ধের বামে বা পূর্বের তারাটির

নাম ঊষা *(Alnitak)* এবং ডানে বা পশ্চিমের তারাটির নাম চিত্রলেখা *(Mintaka)*।

এবার, এ তিন তারা থেকে কিছুটা বামদিকে, উত্তর বা উত্তর-পূর্বে তাকালেই দেখবেন, হালকা লাল রং এর উজ্জ্বল একটি তারা — এটি মূলত কালপুরুষের বাম কাঁধ নির্দেশ করে, এর নাম আর্দ্রা *(Betelgeuse)*। এবার, এই আর্দ্রা থেকে একটি ছোট সরলরেখা টেনে আরেকটু বামে গেলেই পাবেন মিথুন মণ্ডলের তৃতীয় উজ্জ্বলতম তারা "হলবলা ৫" *(Alhena)*। তারপর হেনা থেকে আবারো বামে আরেকটি সরলরেখা টানলে দেখবেন, দুটি প্রায় সমান এবং কাছাকাছি তারার মধ্য দিয়ে যায়। এ তারা দুটিই আমাদের প্রধান অতিথি। এ তারা দুটির স্থানে মিথুন রাশির দুই ভাইয়ের মাথা কল্পনা করা হয়।

এই দুটি তারার মধ্যে তুলনামূলক বামে বা উত্তরে বা আপেক্ষিক কম উজ্জ্বল তারাটি হলো বিষ্ণুতারা (*Castor*)। এটি মিথুনের দ্বিতীয় উজ্জ্বল তারা। আগেই বলেছি, জেমিনিডস উল্কাবৃষ্টির রেডিয়ান্ট বিন্দু হল বিষ্ণুতারার একটু (১°) উপরেই। বিষ্ণুতারার নিচের তারাটি হলো, মিথুন রাশির সবচেয়ে উজ্জ্বলতম তারা, সোমতারা (*Pollux*)।

ইতিপূর্বেই বলেছিলাম, এর জননী এখন আর ধূমকেতু নেই। ফলে, আগামী ১০০ বছর পর এই উল্কাবৃষ্টিটি, হয়তো আর

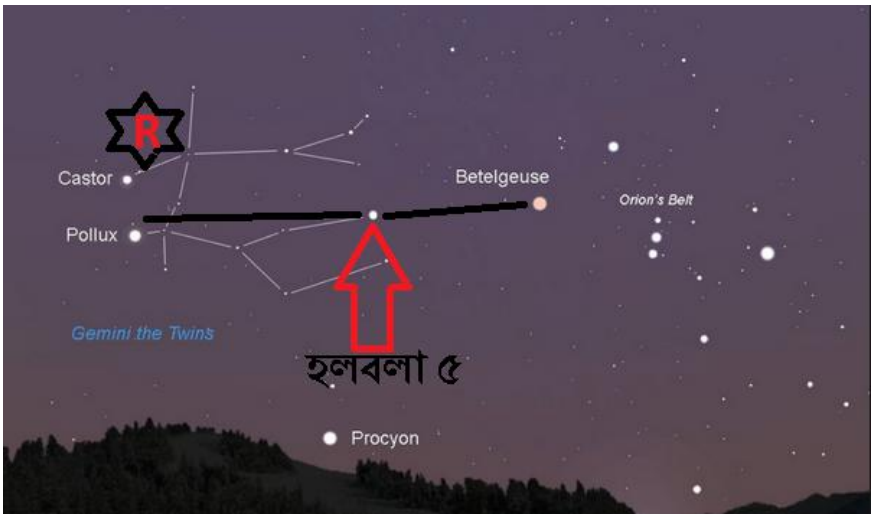

হানা দেবে না। আমাদের এই বিশেষ মূহুর্তের জন্য মহাবিশ্বের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত!

আর কথা না বাড়াই। উল্কাবৃষ্টি দেখার ৩০-৬০ মিনিট আগে মোবাইল, টিভি ও কম্পিউটার ব্যবহার থেকে দূরে থাকুন। অথবা, অন্ধকার রুমে থেকে চোখকে আঁধারে অভ্যস্ত করুন। ডিসেম্বর মাস, রাতে ভালোই শীত পড়ে। তাই উল্কাবৃষ্টি দেখার সময় শীতের পোশাক নিতে ভুলবেন না।

আপনার উল্কাবৃষ্টি দেখা শুভ হোক।

*ZHR : যখন কোনো উল্কাবৃষ্টির কথা বলা হয় তখন আপনি শুনে বা পড়ে থাকবেন যে, ঘণ্টায় ১২০টি জেমিনিডস উল্কা দেখা যাবে। আর এই হিসেবটাই হল ZHR বা (*Zenithal Hourly Rate*)। "ZHR" প্রথমত *"Zenith"*-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত, নাম দেখেই বুঝা যায়। *"Zenith"* মানে আকাশের সর্বোচ্চ স্থান অর্থাৎ আপনি মাটিতে সোজা হয়ে লম্বভাবে বা ৯০° হয়ে দাড়ালে ঠিক মাথার উপর আকাশের যে বিন্দুটির অবস্থান তাই হল *"Zenith"*। এখন, যে মন্ডলে উল্কাবৃষ্টি হবে সেই মন্ডলের *Shower Radiant* বা বর্ষণ বিচ্ছুরক যখন *"Zenith"* - এ অবস্থান করে সে সময়ে আকাশের আদর্শ অবস্থার ভিত্তিতে আপনি বা একজন মানুষ প্রতি ঘণ্টায় কতটি উল্কা দেখবেন তার হার কে বলা হয় ZHR বা *(Zenithal Hourly Rate)*। তবে আপনি সবসময়ই ZHR এর দেওয়া মানের চেয়ে কম উল্কা দেখবেন। এর কারণ - আপনার অবস্থান ও পরিবেশ।

সহায়ক গ্রন্থ

[1] *Gary W. Kronk, Meteor Showers, Springer International Publishing* (2014)
[2] *Jonathan Powell, Cosmic Debris, Springer International Publishing* (2017)
[3] *Phil Simpson, Guidebook to the Constellations, Springer International Publishing* (2012)
[4] *Edith Hamilton, Mythology, Little, Brown and Company* (1942)
[5] মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, তারা-পরিচিতি, বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশন (২০০৬)

স্পিন মানে ঘুর্ণন না

কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ

স্পিন মানে ঘুর্ণন। একটা ফুটবল হাতের আঙুলের ডগায় নিয়ে রোনালডো যে ঘুর্ণি দিলো তাকে বলে ফুটবলের স্পিন। একটি নির্দিষ্ট অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরাঘুরি। আবিষ্কার হলো ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। এগুলো যেহেতু কণা তাই এগুলোকে ওই ফুটবলের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মানে একটা ফুটবলকে ঘুরালে এটি যেমন একটি অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরতে থাকে, একটি কণাও একটি অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরার কথা।

আসলেই এমনটি হয় কি না তা যাচাই করার জন্য বিজ্ঞানী অটো স্টার্ন ও বিজ্ঞানী ওয়াল্টার গার্লেক 1920 এর আশেপাশে একটি পরীক্ষা করেন যা ইতিহাসে *Stern - Gerlach Experi-ment* নামে পরিচিত। সেই পরীক্ষার ফলাফলের হিসেবে দেখা যায় যে যদি কোনো কণা আসলেই নির্দিষ্ট কোনো অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরে তাহলে তার ঘুর্ণন গতি, শুন্যস্থানে আলোর গতির থেকেও বেশি হয়ে যায়। কিন্তু আইন্সটাইন এর স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটির দ্বিতীয় স্বীকার্য হলো - আলোর বেগই সর্বোচ্চ। এর থেকে বেশি বেগ কোনো বস্তু দ্বারা অর্জন সম্ভব নয়। তাহলে এখান থেকে বলা

যায় যে কোনো কণা আসলে বাস্তবে ঘুরে না। কিন্তু ওই যে আগে বিজ্ঞানীরা একে আদর করে স্পিন ডাকত, এখনও একে স্পিনই ডাকে তবে এর অর্থ আলাদা।

স্পিন বলতে আসলে যা বুঝায় তা হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে কোয়ান্টাম কণাকে দেখতে কেমন দেখায়।

(ক) স্পিন 0

যদি একটি কণাকে যে দিক থেকেই দেখা হোক না কেন, সব দিক থেকেই এক রকম দেখায় তাহলে সেই কণার স্পিন বলা হয় 0। যেমন একটি ডট। একে ঘুরালেও একে একই রকম দেখাবে।

স্পিন শুন্য কণার জন্য উদাহরণ

(খ) স্পিন 1

যদি একটি কণাকে 360 ডিগ্রি ঘুরানোর ফলে আবার পূর্বের মতো দেখায় তাহলে সেই কণার স্পিন বলা হয় 1। যেমন তাসের একটি ডেকে থাকা Ace।

স্পিন ১ কণার জন্য উদাহরণ

(গ) স্পিন 2

যদি একটি কণাকে 180 ডিগ্রি ঘুরানোর ফলে আবার পূর্বের মতো দেখায় তাহলে সেই কণার স্পিন বলা হয় 2। যেমন তাসের একটি ডেকে থাকা King।

স্পিন ২ কণার জন্য উদাহরণ

(ঘ) স্পিন 1/2

যদি একটি কণাকে 720 ডিগ্রি ঘুরানোর ফলে আবার পূর্বের মতো দেখায় তাহলে সেই কণার স্পিনকে বলা হয় 1/2। হ্যা, ভগ্নাংশ।

মোবিয়াস স্ট্রিপ

এখন প্রশ্ন হতে পারে, 720 ডিগ্রি ঘুরালে কেন আগের অবস্থানে আসবে? এমন কী আদৌ সম্ভব? 360 এর মধ্যেই চলে আসার কথা না? উত্তর হচ্ছে 720 ডিগ্রিতে যা আসবে তা 360 ডিগ্রিতে না আসাও সম্ভব। নিচে থাকা মোবিয়াস স্ট্রিপটি দেখো। একটি কণা এখান থেকে যাত্রা শুরু করে আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসতে তাকে স্ট্রিপটি দুইবার চক্কর দিতে হচ্ছে মানে 720 ডিগ্রি।

তো, সবশেষে যা বুঝাতে চাচ্ছি, তা হলো, স্পিন মানে ঘুর্ণণ না।

৭২০ ডিগ্রির ঘুর্ণন পর্যবেক্ষণ করতে এই কিউ-আর কোডটি স্ক্যান করুন।

কোপেহেনগান ইন্টারপ্রেটেনশন

আশরাফুল ইসলাম মাহি

বলা হয়ে থাকে, বিংশ শতাব্দির সবচেয়ে ভয়াবহ থিওরিগুলোর একটা হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্স। কেনই-বা ভয়াবহ হবে না!

যে বলে, কণা একই সাথে দুই-তিন জায়গায় থাকতে পারে, কণা নিজেই নিজের জানে না সে কোথায় আছে, এমনকি কণার একটা ইনফরমেশন ধরতে গেলে আরেকটা ইনফরমেশন পালিয়ে যায়, কণা টানেলিং করে দূর্ভেদ্য পটেনশিয়াল এনার্জির দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে, যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স কি না বলে কণারা নিজেদের মাঝে যোগাযোগ করতে পারে তাও আবার আলোর বেশি বেগে (!) — সেই থিওরি যদি ভয়াবহ না হয় তো হবেটা-কে?!

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে অবশ্য ওপরে বলা সব জিনিস কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ছিল না, তবে যেগুলো ছিল, সেগুলো ফিজিসিস্টদের কীরকম স্ট্রেসের মাঝে ফেলে দিয়েছিল, সেটা হয়তো তাঁদের অবস্থানে না গেলে বোঝা যাবে না। এই সময়টায় শতাব্দীকাল আগের

ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স যেন ভেঙে পড়েছিল, সহজ স্বাভাবিক ঘটনা তখন ভয়ঙ্কর রূপে ধরা দিয়েছিল বিজ্ঞানীদের কাছে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অদ্ভুত সব নিয়মের পেছনের কারণটা কী?

এটা কি আমাদের মাপার যন্ত্রের ত্রুটি, না এটাই সত্য, এটাই সার্বজনীন, মহাবিশ্ব এভাবেই চলে কি?
কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নিয়মগুলো কেন এমন, এক্সপেরিমেন্টের অদ্ভুত ফলাফলগুলো কেন আর এলোই বা কোত্থেকে, সেটা নিয়ে অনেকরকমের ব্যাখ্যা আছে।

বিংশ শতাব্দির শুরুর সেই সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ব্যাখ্যাটা হলো কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশন।

১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ডেনমার্কের বর্তমান রাজধানী কোপেনহেগেনে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের দুই মহারথী, নিলস বোর আর ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ মিলে কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে নিয়ে নিজেদের বোঝাপড়াগুলো থেকে কোয়ান্টামের এইসবের ব্যাখ্যা দাড় করাতে চেষ্টা করেন। এই অতি স্বাভাবিক, দুই ফিজিসিস্টের বোঝাপড়াকে এখন আমরা চিনি কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশন বলে। পরে আরও অনেক ফিজিসিস্ট এইটার ওপর আলোচনা-সমালোচনা করেন, তবে মূল ব্যাখ্যাগুলো মূলত বোর আর হাইজেনবার্গ থেকেই আসে। দেখার মতো বিষয় : "ফিজিক্সের ইতিহাসে সবচেয়ে রহস্যময় মতবাদগুলোর একটা আসে মাত্র দুইজন ফিজিসিস্টের মাথা থেকে!"
তো, কী ছিল এই ইন্টারপ্রিটেশন? কী আর কেমন ব্যাখ্যা এটা? দেরি না করে চলেন দেখে আসি।

কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশন বলে, কোয়ান্টাম মেকানিক্স একেবারে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানতে দেয় না। কণার ভরবেগ, শক্তি, যা-ই মাপতে যান, এমনকি স্পিন মাপতে গেলেও

অনিশ্চয়তা আসবে। এগুলো আসলে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির একেকরকম ভার্সন। অবস্থান-ভরবেগ অনিশ্চয়তা হলো $\Delta x. \Delta p \geq h/4\pi$

শক্তি-সময় অনিশ্চয়তা হলো $\Delta E. \Delta t \geq h/4\pi$। এরকম আরও আছে। প্রত্যেকটাই বলে যে এই জোড়ার একটাকে জানতে গেলে আরেকটা ধরা-ছোয়ার বাইরে চলে যাবে। ভার্চুয়াল পার্টিকেলের আয়ু মাপতে যাবেন তো হারিয়ে যাবে এর এনার্জির ইনফরমেশন। এমনকি আপনি না মাপলেও এই নীতি অনুযায়ী বেশি শক্তির ভার্চুয়াল কণা অল্প আয়ু পাবে, আর কম শক্তির কণা বেশি আয়ু পাবে!

কোয়ান্টাম মেকানিক্স একটা রেঞ্জের মাঝে 'দেখার মতো করে' কাজ করে। বেশি বড়ো রেঞ্জ নিলে কোয়ান্টাম ইভেন্টগুলো মিলিয়ে-ঝিলিয়ে গড় হয়ে যায়, আর অনিশ্চয়তা বোঝা যায় না। কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল কোনো কিছুই বোঝা যায় না। এই অবস্থা হলো আমাদের জগৎ, ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স যেটাতে সহজেই কাজ করে।

প্রত্যেকটা কণার সাথে তরঙ্গ যে থাকে বলে বলা হয় (ওয়েভ ফাংশন), সেটা আসলে সম্ভাবনার তরঙ্গ। এটাকে বলে ম্যাক্স বর্নের রুল। একটা সিস্টেমকে মাপা হলে এই ওয়েব ফাংশনই কণার বৈশিষ্ট্য বলে দেয় সম্ভাবনা আকারে। এই ওয়েভ ফাংশনের বাইরে কণার কোনো তথ্য থাকে না, যা পাওয়া যাবে সব এইটা থেকেই পাওয়া যাবে।

সিস্টেমকে এক্সপেরিমেন্টে ফেলতে হলে অবশ্যই আমাদের ক্লাসিক্যাল ডিভাইসগুলোর সাথে ইন্ট্যারাক্ট করতে হবে। এটাকে বলে কোয়ান্টাম মেজারমেন্ট। মাপার পর কণা একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় আসবে (যেটাকে বলে আইগেন স্টেট)।

এক্সেপেরিমেন্টের আগে অনিশ্চয়তা থাকলেও সিস্টেমকে মাপার পরে সেটার যে রেজাল্ট পাওয়া যাবে,

সেটা আসলে ক্লাসিক্যাল। সেটাতে কোনো রহস্য নেই। একটা কণাকে মাপার আগে সে স্পিন আপ আর ডাউন – দুই অবস্থায়ই একইসাথে থাকে। সেটাকে লেখে এভাবে,

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|\text{spin Up}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\text{spin Down}\rangle \ . |\Psi\rangle$$

হলো সুপারপজিশন নির্দেশ করছে এখানে। একাধিক স্টেটে (এখানে spin Up আর spin Down) সুপারপজিশনে আছে কণা। মাপার আগে দুই স্টেটে থাকার সম্ভাবনা হাফ হাফ।

(Ψ এর বর্গ এটা বলে যে মাপার পরে কণাকে কোন স্টেটে পাওয়ার সম্ভাবনা কী রকম। এই Ψ আবার বের করতে হয় শ্রোডিঙ্গারের ইকুয়েশন সমাধান করে! এত ঝামেলায় না গিয়ে আমরা যদি ধরে নিই এইটার সম্ভাবনা হাফ করে)

মাপা হলে কণাকে যে-কোনো একটা স্টেটে পাওয়া যাবে। মাপলে হয়তো $|\Psi\rangle = |\text{spin Up}\rangle$ পাওয়া যাবে। আমরা সবাই দেখব যে কণাটার স্পিন আপ। মাপার আগে কণাটা একইসাথে স্পিন আপ আর ডাউন অবস্থায় থাকবে!!

ওয়েভ ফাংশন একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাপা হলে কণা হয় তরঙ্গ হিসেবে ধরা দেবে, না হয় কণা হিসেবে।

পর্যবেক্ষণের সময় পর্যবেক্ষণের ইন্সট্রুমেন্টগুলো বা কাজগুলো সিস্টেমকে নাড়াচাড়া করে দেবে। যেটার কারণে একটা সিস্টেমের ভেতরে আসলে কী ঘটে, সেটা সরাসরি পর্যবেক্ষণ সম্ভব না। (এখানে একটা জিনিস বলে রাখা দরকার, অনিশ্চয়তা নীতি বা কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ঘটনাগুলো কিন্তু এই পর্যবেক্ষণের সমস্যার জন্য এমন করে না। সেগুলো আসলেই ওরকম অদ্ভুত। খেয়াল করেন, ওপরের সবগুলো পয়েন্ট কিন্তু সেটাই বলছে!)

এই তো গেল কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশনের ব্যাপারগুলো। আসলে জানি না কী মনে হচ্ছে

আপনাদের, কিন্তু আমার কাছে এটাকে কোনো ‘ব্যাখ্যা’ হিসেবে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। এই ব্যাখ্যা নিজেই একেকটা রহস্যের কথা বলে!

কোয়ান্টাম জগতটা যদি আমাদের বাস্তব জগতে কাজ করত, তাহলে কী হতো ভাবা যায়!? আমরা হয়তো তখন শ্রোডিঙ্গারের বিড়ালের মতো মৃত আর জীবিত-র সুপারপজিশনে থাকতাম! কেউ কল করে ‘কোথায় আছেন?' জিজ্ঞেস করলে হয়তো বলা লাগত, ‘আমি ঢাকা, সিরাজগঞ্জ আর পাবনার সুপারপজিশনে আছি।’ কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলে বলা লাগত

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |\text{ভালো}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |\text{অসুস্থ}\rangle$$

চিঠি কীভাবে লিখতে হতো তখন?

হা হা হা।

[সূত্র - উইকিপিডিয়া ও চা, কফি ও কোয়ান্টাম মেকানিক্স]

এইযে আপনি!
একটু শুনবেন?

ট্যাকিয়ন একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এই সংগঠনের নানা কাজে প্রয়োজন হয় টাকার। প্রতিবছর আমরা কিছু প্রতিযোগিতার আয়োজন করি (যেমন অক্টোবর মাসের শুরুতে ইন্টিগ্রেশন বি, এছাড়া মাঝে মধ্যে বিবিসিট্যাকিয়ন ইত্যাদি প্রতিযোগিতা)। এসকল প্রতিযোগিতায় পুরষ্কারের জন্য প্রয়োজন টাকার। কখনো কখনো আমাদের লেখকদের, ডিজাইনারদের, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট টিমের সদস্যদের জন্য একটি ছোট্ট উপহার দিয়ে থাকি। ওয়েবসাইটের ডোমেন রিনিও করতে ও সার্বিক তত্ত্বাবধানেও কিছু পরিমাণ খরচ আসে। আমাদের নানা কার্যক্রমে ব্যানার, ফেস্টুন, যন্ত্রপাতি বানাতে/কিনতেও অর্থের প্রয়োজন। এসকল ক্ষেত্রে আমরা সবসময়ই আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে এসেছি! আশা করছি আপনারা এখনো আমাদের কাজগুলোতে সাহায্য করবেন।

আমাদের আর্থিকভাবে সাহায্য করতে আপনার অর্থমূল্য বিকশা করুন

+8801944941674

নাম্বারে যত খুশি তত!

ধন্যবাদন্তে!

টিম ট্যকিয়ন

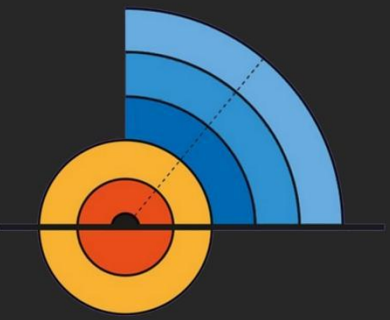

কোয়ান্টাম মেকানিক্স

কোথায় কাজে লাগে?

কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ

আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে মাথা নষ্টকারী শাখা কোনটি, তাহলে আমি নির্দিধায় বলে দিতে পারব সেই শাখাটি হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নানা আচরণ সম্পর্কে সবাই অবগত আছি। একটি বিড়াল একই সঙ্গে জীবিত ও মৃত থাকতে পারে, একটি ইলেকট্রন একই সাথে কণার মত আবার একই সাথে তরঙ্গের মত আচরণ করতে পারে। দুইটি কণা পরস্পর থেকে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে থাকলেও মূহুর্তের মধ্যে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। নিউটনের ফিজিক্স প্রতিষ্ঠার পর এমন অবস্থা হয়েছিল যে আমরা সামনের ১০০ বছরে কবে কোথায় গ্রহণ দেখতে পারব তাও বের করে ফেলেছি। কিন্তু এই কোয়ান্টাম মেকানিক্স এসেই আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে দিয়েছিল, আমরা কখনো একদম সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব না। কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ফেনোমেনাগুলো দেখলে আপাতদৃষ্টিতে বাস্তববিরোধী মনে হয়। তাই কোয়ান্টাম মেকানিক্সেরই অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এর সম্পর্কে বলেছিলেন,

> “কোয়ান্টাম মেকানিক্স যত বেশি সঠিক বলে প্রমাণিত

হচ্ছে, এটি ততই অর্থহীন মনে হচ্ছে।”

তবে জানেন কি, আপাতদৃষ্টিতে বাস্তববিরোধী এই শাখাটার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে বর্তমানের প্রযুক্তির এই যুগ। আপনি যেই স্ক্রিনে তাকিয়ে এই লেখাটা পড়ছেন তাতেও রয়েছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের হাত। চলুন একটু ঘুরে ফিরে আসি আজকের যুগের ভিত্তি ইলেকট্রনিক তথা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটি অ্যাপ্লাইড শাখার কাছ থেকে।

ডায়োডের গল্প

পরমাণুর মধ্যে থাকা শক্তিব্যান্ড কিংবা যোজ্যতা ব্যান্ডের ধারণাগুলো কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকেই আসে। এই শক্তি ব্যান্ডের মধ্যে কতটুকু গ্যাপ থাকলে তা একটি পরিবাহী হিসেবে কাজ করবে তার কতটুকু গ্যাপ থাকলে তা অপরিবাহী কিংবা অর্ধ-পরিবাহী হবে তার হিসাব-নিকাশও কোয়ান্টাম মেকানিক্স দ্বারাই করা হয়।

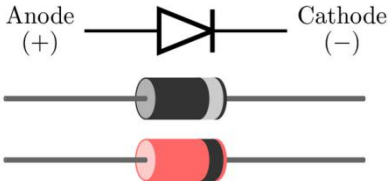

ডায়োডে বায়াসিং-এর সময় কোয়ান্টাম টানেলিং ঘটে

কেলাসে ভেজাল মিশিয়ে পরিবাহিতা বৃদ্ধির ধারণাও আসে কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকেই। এই শক্তি ব্যান্ডের ধারণা থেকেই আমরা পেয়েছি ডায়োড। ডায়োডের সাহায্যে আমরা কারেন্টকে দ্রুত চলতে সাহায্য করতে পারি আবার একে বন্ধও করে দিতে পারি। ডায়োডে বায়াসিং করার সময় ঘটে কোয়ান্টাম টানেলিং। এই ডায়োড থেকেই আমরা আজ পেয়েছি এলইডি (লাইট ইমিটিং ডায়োড)। চিন্তা করুন তো, আপনার বাসায় যদি আজ সাশ্রয়ী এলইডি বাল্বটি না থাকত তাহলে কত টাকা বেশি গুণতে হতো আপনাকে? আপনার মোবাইলের স্ক্রিনগুলোতেও কাজ করছে এই প্রসেসটি।

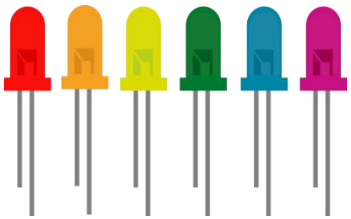

লাইট ইমিটিং ডায়োড বা আলো বিচ্ছুরণকারী ডায়োড বর্তমানে সাশ্রয়ী মূল্যে আলো ছড়ানোর কাজ করছে

ট্রানজিস্টরের কথা

আমাদের আধুনিক যত ইলেকট্রনিক ডিভাইস রয়েছে সবগুলোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে যে ছোট্ট যন্ত্রটি তার নাম ট্রানজিস্টর। ১.৫-২ সেন্টিমিটার সাইজের তিন পা-যুক্ত এই যন্ত্রটি একই সাথে সুইচ, সিগন্যাল অ্যামপ্লিফায়ার, রেক্টিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ট্রানজিস্টর আবিষ্কার হওয়ার আগেও কম্পিউটার ছিল। তবে তখন ট্রানজিস্টরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হত ভ্যাকুয়াম টিউব। এই ভ্যাকুয়াম টিউব আবার খুব ভঙ্গুর আর প্রচন্ড তাপ উৎপন্নকারী। তাই কম্পিউটারের সাইজও রাখতে হতো অনেক বড়ো আর এই ভ্যাকুয়াম টিউব একবার ভেঙ্গে গেলে তা পুনরায় ঠিক করাও ছিল কষ্টকর। আকারে বেশ বড়ো ও দামী হওয়ায় কম্পিউটার ব্যবহার করত কেবল আইবিএম কিংবা নাসার মতো বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলো।

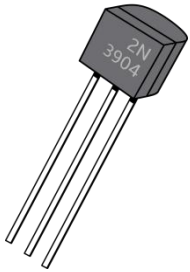

দুইটি ডায়োড বায়াসিং করে ট্রানজিস্টর বানানো হয়। ইলেকট্রনিক যুগের সূচনার জন্য এই ট্রানজিস্টর দায়ী

কম্পিউটার থেকে বর্তমানের স্মার্টওয়াচের সাইজ এত ছোটো বানাতে এই ট্রানজিস্টরই কাজে দিয়েছে। এই ট্রানজিস্টর আবার কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ট্রানজিস্টর দুইটি ডায়োডের সমন্বয়ে গঠিত। এককালে যে রেডিয়ো শুনেছেন তার ভিত্তিও কিন্তু এই ট্রানজিস্টর। আর ট্রানজিস্টরের ভিত্তিই হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নীতিগুলো।

লেজার

LASER (Light Amplification by Stimulated Emmision of Radiation) হলো একটি এমন যন্ত্র যা সুসংগত ও উচ্চ শক্তিসম্পন্ন আলো নির্গত করতে সক্ষম। এই লেজার টেকনোলজির ভিত্তিও হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। আপনি কোনো একটি শপিংমলে গেলে আজকাল খাতায় লিখে লিখে কোনো দোকানী হিসাব করে না। তার কাছে একটি যন্ত্র থাকে যাকে বলে বারকোড রিডার আর আপনার কিনতে চাওয়া পন্যের গায়ে লাগানো থাকে একটি বারকোড। ওই যন্ত্রটিকে বারকোডের উপরে ধরলে সেখান থেকে একটি লেজার বের হয় ও আপনার বারকোডে থাকা গোপন কোড পড়ে ফেলে ও কম্পিউটারে সেই অনুযায়ী দাম শো করে। আজকাল নানা সার্জারিতেও লেজারের এই শক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ডিভিডি ও ব্লু-রেতেও ব্যবহার হচ্ছে লেজারের নীতি। বড়ো-সরো কাঁচ কিংবা পাথর কাটতেও ব্যবহার হচ্ছে এই লেজার টেকনোলজি। ২০১৭ সালে যে মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্ত করা হয় তার নেপথ্যেও কাজ

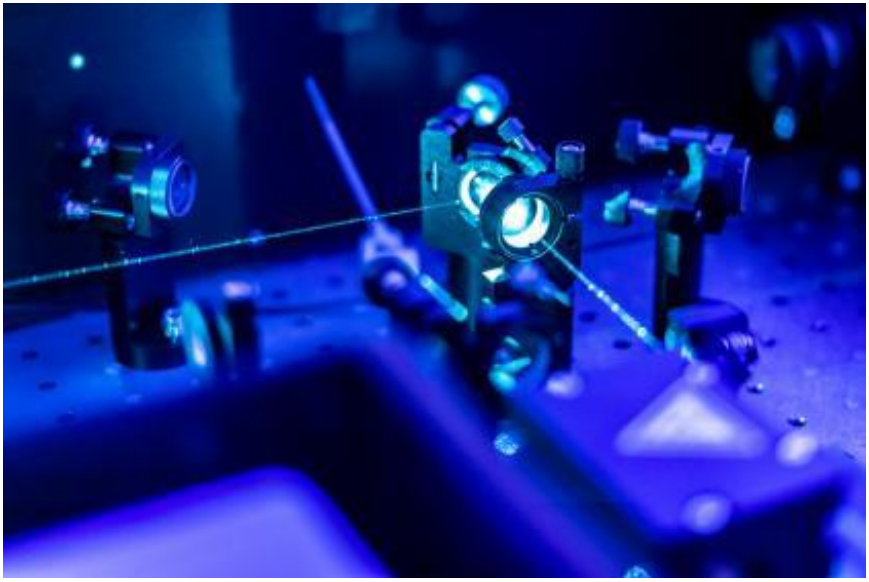

লেজার টেকনোলোজি দিয়ে বারকোড পড়া যায়।

করেছে এই লেজার টেকনোলজি।

কোয়ান্টাম-কম্পিউটার

আজকাল আমাদের অনেককিছুই হিসাব-নিকাশ করতে হয়। কখনো কখনো এই হিসাব-নিকাশ করতে কয়েক মাস লেগে যায়। তবে এমন কিছু হিসাব রয়েছে যেগুলো করতে হয়তো কয়েক হাজার বছর লেগে যাবে। তা বসে বসে হিসাব করা মানুষের পক্ষে সম্ভব না। তাই এমন ক্যালকুলেটর আবিষ্কার করতে হবে তা আরো দ্রুততার সাথে এই হিসাব করতে সক্ষম। এই ধরণের ক্যালকুলেটরই হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটার। এটি কয়েক মিলিয়ন বছরের হিসাব কয়েক বছরে করে দিতে সক্ষম আর কয়েক বছরের হিসাব কয়েক দিনে করে ফেলতে সক্ষম। এই কোয়ান্টাম - কম্পিউটার নিজেই কোয়ান্টাম সুপারপজিশন নীতির সাহায্যে কাজ করে। হয়তো নিকট ভবিষ্যতে আমাদের সকলের হাতেই থাকবে একটি করে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ও বদলে দিবে আমাদের জগত দেখার দৃষ্টিভঙ্গী।

সুপারকন্ডাক্টর

একটি পরিবাহী তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতে তারের রোধ ধর্মের কারণে একসময় ওই বিদ্যুৎ থেমে যাবে আর তার উত্তপ্ত হয়ে যাবে। এতে প্রচুর পাওয়া লস হয়। সাধারণভাবে ওহমের সূত্র আমাদের এটিই বলে। তবে ১৯১১ সালে হেনরি কেমারলিন ওনস নামের একজন বিজ্ঞানী দেখান এমন কিছু পদার্থ আছে যাদেরকে আমরা তাদের সংকট তাপমাত্রায় শীতল করলে তাদের মধ্যে আর রোধ থাকে না। অর্থাৎ এটিতে কোনো পাওয়ার লস হয় না। ফলে একটি ইলেকট্রিক সার্কিটের কর্মদক্ষতা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১০০%। একে বলে সুপারকন্ডাক্টর। এই সুপারকন্ডাক্টরের ধর্ম ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রেও চলে আসে কোয়ান্টাম মেকানিক্স।

বর্তমানে সুপারকন্ডাক্টরের সাহায্যেই দ্রুতগ্রামী ট্রেন বানাচ্ছে উন্নত বিশ্বের নানা দেশ।

সুপারকন্ডাক্টরের সাহায্যে কোনোপ্রকার পাওয়ার লস ছাড়াই কারেন্ট প্রবাহিত করা যায়

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আরো নানা দিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনেই লাগে। তবে লেখার আকার বড়ো হয়ে যাচ্ছে বলে আজ আর আলোচনা করলাম না। আবার আড্ডা হবে কোনো একদিন।

রুশলান রহমান দীপ্ত

কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি আমরা আমাদের চারপাশে প্রকৃতিকে অবলোকন করলে দেখতে পাই ছোটো-বড়ো বিচিত্র রকমের বস্তুর সমাহার। এর মধ্যে কিছু কিছু আছে খুবই বিশাল আর কিছু আছে সূক্ষাতিসূক্ষ। পদার্থবিজ্ঞান আমাদের এ সকল বস্তুর গতি প্রকৃতি, আচরণ, ধর্ম সম্পর্কে জানিয়ে থাকে। কিন্তু আফসোস পদার্থবিজ্ঞান, সকল বস্তুর আচরণবিধিকে একই নীতির আওতায় আনতে পারিনি। বৃহৎ স্কেলে বস্তুর গতি প্রকৃতি নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে সাহায্য নিতে হয় জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটির। এর জনক বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন। অপরদিকে প্রকৃতিকে মৌলিকভাবে, সুক্ষাতিসুক্ষ ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদেরকে সাহায্য নিতে অন্য একটি তত্ত্বের। এরই নাম কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি।

গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস সর্বপ্রথম এই উক্তি উত্থাপন করেন যে পদার্থকে ভাঙতে শুরু করলে একসময় এমন একটি ক্ষুদ্রাকার, অতি সূক্ষ্ম কণা পাওয়া যাবে যে তাকে আর ভাঙ্গা সম্ভব না। যদিও এর পক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি। তিনি এই কণার নাম দেন “অ্যাটম” যার অর্থ অবিভাজ্য। আস্তে

আস্তে আমাদের পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ আরো উন্নত হওয়ার সাথে সাথে এটি প্রমাণিত হয় যে পরমাণুকে ভাঙ্গা সম্ভব। সর্বাধুনিক তত্ত্ব মতে পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত। একটি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন যাকে আমরা একত্রে নিউক্লিয়াস বলি। হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম এর কেন্দ্রে শুধু প্রোটনই থাকে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে সেই ডেমোক্রিটাস থেকে রাদারফোর্ড ও বোর পর্যন্ত পদার্থের মূলে রয়েছে কণাই। আসলে কণা কী, এর বৈশিষ্ট্য কী, এর গতি-প্রকৃতি কেমন এটি গঠিত হয় কীভাবে তাতে বিশেষ কোনো জোর দেয়া হয়নি কখনোই। যেমন ধরুন আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি ইলেকট্রনের রং কী? যদিও রং বলতে ইলেকট্রনের কিছু নেই। আসলে কণা জিনিসটা কী, এর উৎপত্তি কীভাবে, যা দ্বারা পুরো এই মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু তৈরি তার বৈশিষ্ট্যগুলো কেমন এ সকল প্রশ্নের উত্তর দাঁড় করানোর জন্যই দেওয়া হয়েছিল কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি।

ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন "কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি" শব্দটির সাথে দুটি অংশ জড়িত -

১. কোয়ান্টাম
২. ফিল্ড থিওরি

ফিল্ড থিওরির সাথে আমরা আগে থেকেই পরিচিত। এর জনক মাইকেল ফ্যারাডে। দুটি চার্জিত বস্তু বা দুটি চুম্বককে কাছাকাছি আনলে এদের মধ্যবর্তী আকর্ষণ-বিকর্ষণ ব্যাখ্যা করার তাগিদে মাইকেল ফ্যারাডে সর্বপ্রথম ফিল্ড থিওরির অবতারণা ঘটান। তার মতে দুটি চার্জিত বস্তুকে কাছাকাছি আনলে চার্জিত বস্তু দুটি নিজেদের সৃষ্ট ক্ষেত্র দ্বারা আকর্ষণ বিকর্ষণ করে থাকে। কোন চার্জিত বস্তু দ্বারা সৃষ্ট ক্ষেত্র অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত। কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিতেও ক্ষেত্রের কথা বলা কিন্তু তা সাধারন ফিল্ড থিওরি থেকে আলাদা। কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির

মূল বক্তব্য হচ্ছে- "মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি মৌলিক কণা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সৃষ্ট কম্পন ছাড়া কিছুই নয়।" যেমন ধরুন যে ইলেকট্রনকে আমরা অতি সূক্ষ, শক্ত কণা বলে জানি তা হচ্ছে মূলত ইলেকট্রন ফিল্ডে কম্পন। এমনিভাবে কোয়ার্ক ফিল্ডের কম্পন হচ্ছে কোয়ার্ক, নিউট্রিনো ফিল্ডে কম্পন হচ্ছে নিউট্রিনো। এখানে "কোয়ান্টাম" শব্দটি যুক্ত হয়েছে কারণ এই ফিল্ডগুলো ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম থিওরি মেনে চলে। ফিল্ডগুলো একটি ন্যূনতম শক্তির স্বাভাবিক সংখ্যার গুণিতক পরিমান শক্তি নিয়ে কম্পিত হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ফিল্ডগুলোর ন্যূনতম শক্তি কিন্তু শূন্য নয়। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি মতে কোনো সিস্টেমে উপস্থিত শক্তির পরিমাণ আমরা কখনো সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে বলে দিতে পারব না। ফলে আমরা এও বলতে পারব না যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে কোন ফিল্ডে শক্তির পরিমাণ শুন্য । যাই হোক, যখন কোন ফিল্ডে যে-কোনো রকমের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বাইরে থেকে শক্তি প্রদান করা হয় তখন সে শক্তি ফিল্ডে কম্পনের সৃষ্টি করে। আর এই কম্পন ম্যাক্রোস্কোপিক লেভেলে কণা হিসেবে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়।

এখানে একটা জিনিস আগেই পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত তা হলো ফিল্ড দ্বারা কী বোঝানো হচ্ছে? আর এই ফিল্ডের কম্পনই বা কী? আসলে এই ফিল্ড হচ্ছে একটি ত্রিমাত্রিক সত্ত্বা যা শূন্যস্থানে অবস্থান করে। স্পেস এর প্রত্যেকটা পয়েন্টে একটি নির্দিষ্ট মান ধারণ করে এই ফিল্ডগুলো। যখনই ফিল্ডে অবস্থিত কোনো পয়েন্ট এর মান কোনো কণার নিশ্চল ভর-শক্তির সমান হয় তখনই সেখানে একটি কণার উদ্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। এই কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি থেকেই উদ্ভব হয়েছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মডেলের। যারা স্ট্যান্ডার্ড মডেল সম্পর্কে জানেন না তাদের জন্য বলে রাখি, এটি হচ্ছে অনেকটা পদার্থবিজ্ঞানের পর্যায়সারণির মত।

মহাবিশ্বের বস্তুকণা এবং বলবাহী কনাকে ক্লাসিফিকেশন করার জন্য এই স্ট্যান্ডার্ড মডেলের উদ্ভব।

কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির সফলতা ও সীমাবদ্ধতা

মজার ব্যাপার হলো, যদি বলা হয় পুরো 'বিজ্ঞান' নামক বিষয়ে সবচেয়ে সফল তত্ত্ব কোনটা? উত্তর আসবে "কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি"। আর যদি বলা হয় সবচেয়ে বাজে তত্ত্ব কোনটা? এরও উত্তর আসবে "কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি"।

ইলেকট্রনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে এর নাম "*Electron's Anomalous Magnetic Dipole Moment*"। কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির সাহায্যে এই প্যারামিটার এর মান 1 বিলিয়ন অংশের 10 ভাগ পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। প্রকৃতির চারটি মৌলিক বলের মধ্যে তিনটি মৌলিক বলই এই থিওরির প্রদানকৃত সূত্র মেনে চলে। আফসোসের বিষয়, আমাদের চিরচেনা বল "মহাকর্ষ" এই থিওরির আওতায় নেই।

এছাড়াও শূন্য স্থানে উপস্থিত শক্তি ঘনত্বের মান এই থিওরি মোতাবেক নির্ণয় করলে আধুনিক পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের চেয়ে $১০^{১২০}$ গুণ বেশি নামে। এভাবেই আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের সবচেয়ে সফল তত্ত্বই হয়ে ওঠে সবচেয়ে ব্যর্থ তত্ত্ব। আধুনিক কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি এই মহাবিশ্বের চার ভাগের তিনভাগ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। তারপরেও বিগ ব্যাং ও ব্ল্যাকহোল সিঙ্গুলারিটি, ডার্ক ম্যাটার, ডার্ক এনার্জির মত কিছু অমীমাংসিত বিষয় রয়েই গেছে। মহাবিশ্বের ভরের প্রায় 84 শতাংশ ডার্ক ম্যাটার।

কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড মডেল এই ডার্ক ম্যাটার সম্পর্কে কোন কিছু বলতে অক্ষম। বিশ্বে পদার্থ তুলনায় প্রতি পদার্থের পরিমাণ কেন কম তাও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ। এছাড়াও স্ট্রিং সিপি প্রবলেম ও নিউট্রিনো ওসিলেশন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না তত্ত্বটিতে। সুপার সিমেট্রি বা

অতিপ্রতিসাম্যসহ কিছু কিছু মডেল আছে যাতে শতশত নতুন কণা প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সেই কণাগুলোর কোনোটিকে কখনো শনাক্ত করা যায়নি। কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি অনুসারে মহাবিশ্বর সৃষ্টি, মহাবিশ্বর শুরু শূন্যতা থেকে। শুন্যতা বলতে মূলত কসমোলজিস্টরা যা বুঝান তা হচ্ছে কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম। আগেই বলা হয়েছে হাইজেনবার্গ-এর অনিশ্চয়তার নীতি অনুসারে শুন্য স্থান কখনো শুন্যতা প্রাপ্ত হতে পারবে না। শুন্য স্থানে থাকা কোয়ান্টাম ফিল্ডগুলো অন্তত পক্ষে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন শক্তি প্রাপ্ত হয়ে হলেও কম্পিত হতে থাকবে এবং প্রতিনিয়ত সেখানে ভার্চুয়াল পার্টিকেল (আসলে পার্টিকেল না) উৎপন্ন হতে থাকবে। কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি থেকেই বিখ্যাত ইনফ্লেশান থিওরির জন্ম, যার দ্বারা বর্তমানে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা হয়।

কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি অনুসারে মহাবিশ্বর অন্তিম পরিণতি “প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানই চায়/চাচ্ছে সর্বনিম্ন শক্তি প্রাপ্ত হতে...” একটি বস্তুকে হাত দিয়ে উপরে তুলে দিয়ে ছেড়ে দিলে তা নিচে পড়ে যায় কারণ এক মাত্র নিচের দিকে গেলেই এটি তার বিভব শক্তি হারিয়ে নিম্ন শক্তি প্রাপ্ত হতে পারবে। কোয়ান্টাম ফিল্ডগুলোর জন্যও এই কথাটি প্রযোয্য। ধরুণ, আমি একটি বেলুনে কিছু বাতাস ভরে তাপ দেওয়া শুরু করলাম। এতে কী হবে- বেলুনের অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়তে থাকবে। এই শক্তির ঘনত্ব কমানোর জন্য বেলুনটি প্রসারিত হওয়া শুরু করবে। কোয়ান্টাম ফিল্ডগুলিও অনেকটা এমনি। বিগ ব্যাং হওয়ার আগ পর্যন্ত সকল ফিল্ড উচ্চতর শক্তি যুক্ত ছিল। কোনো এক অজানা কারনে হঠাৎ এদের শক্তি ঘনত্ব কমতে শুরু করে। শক্তি ঘনত্ব কমানোর জন্য এরা স্থানকে প্রসারিত করা শুরু করে। কিন্তু এদের একটি ফিল্ড ছিল ব্যতিক্রমি। এটি হলো সেই হিগস ফিল্ড। সকল ফিল্ড তাদের নিম্ন শক্তিস্তরে যেতে পারলেও হিগস ফিল্ড যায়নি। এটি এখনো এর উচ্চ

শক্তিমাত্রায় ঝুলছে। হিগস ফিল্ড যদি তার *Stable* অবস্থায় থাকতো - তবে এর ভর হতো 127 GeV কিন্তু এর প্রকৃত ভর হচ্ছে 126 GeV। এই হিগস ফিল্ড যে-কোনো সময় এর নিম্ন শক্তি অবস্থান (*Zero Point State*)-এ নেমে আসতে পারে। আর যদি এমন হয় তবে হিগস ফিল্ড তার কার্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে এবং সকল কণা ফোটনের মতো ভর শুন্য হয়ে পরবে এবং আলোর গতিতে ছুটতে শুরু করবে। পরমানুতে ভাঙ্গন ধরবে। ইলেকট্রন-গুলো কক্ষপথ থেকে সরে আসবে। মহাকর্ষ বল বলতে কিছু থাকবে না। মহাবিশ্বর এই পরিনতি *"Vacuum-Decay"/Big Slurp* নামে পরিচিত। বিখ্যাত এই তত্ত্বটি আধুনিক বিজ্ঞানের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব। যদিও এর অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন কীভাবে এই তত্ত্বের সাথে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সংমিশ্রিত করে দাঁড় করাবেন একটি "থিওরি অফ এভরিথিং"।

তরঙ্গের পোলারাইজেশন কী তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? কোনো সমস্যা নেই! দেখে নিন আমাদের অনুবাদ করা ভিডিওটি!

https://fb.watch/9BI4wSWONf/

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বইগুলো

মূল - মিথুনা ইয়োগানাথান, পিএইচডি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়
অনুবাদ - কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ
[আংশিক ও পরিমার্জিত অনুবাদ]

অনেকেই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নানা অদ্ভুতুড়ে কাহিনি সম্পর্কে জানে ও আগ্রহ করে আরেকটু বিস্তারিত জানার জন্য পড়তে চায়। কিন্তু কীভাবে কোন বই দিয়ে শুরু করবে তা বুঝতে পারছে না। তাদের জন্য আজকে কয়েকটি বইয়ের তালিকা দিচ্ছি -

The Feynman Lectures on Physics Vol III
Richard P. Feynman

এই বইটি আমি কোয়ান্টাম লেভেলে একদম বিগিনার থেকে শুরু করে একদম প্রো লেভেলের সকল মানুষদেরই সাজেস্ট করি। সাধারণত কোয়ান্টাম মেকানিক্সের টেক্সটবইগুলো নানা গাণিতিক সমস্যা ও সমীকরণ দিয়ে শুরু করাহয়। কিন্তু রিচার্ড ফাইনম্যান চাইলেন, সকলে গণিত নয় বরং কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে অনুভব করে একে চেনা শুরু করুক। যদি কেউ একে অনুভব করা শিখে যায় তাহলে এর গণিত বুঝাও খুব একটা সমস্যা না। কিন্তু এর উলটো প্রসেসে আগালে কোয়ান্টাম মেকানিক্স খুব ভালোভাবে বুঝা কষ্টকর।

Quantum Mechanics : Theoretical Minimum Leonard Susskind

এই বইটি লেনার্ড সাসকিন্ডের লেকচার সিরিজ থেকে নেওয়া হয়েছে। তার লেকচার সিরিজটি তাদের জন্য ছিল যাদের গণিতের উপর ভালো দক্ষতা ছিল না। তবে তারা কোয়ান্টাম মেকানিক্স শিখতে বেশ আগ্রহী ছিল। এই বইটিতে যেমন মুখের কথায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে এতে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের গভীরের অঙ্কগুলোও বিদ্যমান রয়েছে। এটা একটা সিরিয়াস টেক্সটবুক। একজন স্নাতক পর্যায়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী কোয়ান্টাম মেকানিক্সের যেই যেই বিষয়গুলো জানে, এই বইয়ে তার সবই রয়েছে। তাই যারা গণিত দেখতে পছন্দ করেন না, তারা বইটিকে ভালো নাও বাসতে পারেন। যেহেতু এই বইটি বেসিক থেকে প্রো খুব ফাস্ট এগিয়েছে।

A Modern Approach to Quantum Mechanics John S. Townsend

সাসকিন্ডের বইয়ের সাথে এই বইটি পড়তে পারেন। এই বইটি ফাইনম্যান লেকচারস থেকে অনুপ্রাণিত এবং আমার অন্যতম প্রিয় কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটি বই।

Modern Quantum Mechanics J. Sakurai

আমার সবচেয়ে প্রিয় কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বই হচ্ছে এটি। এটি আসলে বিশ্বের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ানো হয়। তাই এটি অনেক বিস্তারিত পর্যায়ে কোয়ান্টাম মেকানিক্স আলোচনা করেছে। অন্যদিকে ফাইনম্যান লেকচারস এর মতো এতো বিস্তারিত না।

কোয়ান্টাম এনটেঙ্গেলমেন্ট

তাইফ মাহবুব স্বপ্ন

মনে করুন, আপনি কোন রেল লাইনের উপর দিয়ে হাটছেন। কিছুক্ষন পর টের পেলেন ট্রেন আসছে। আপনি কী করবেন? রেললাইন থেকে সরে যাবেন? না কি নিজের চোখ বন্ধ করবেন? এই ভেবে যে যেহেতু ঘটনা আপনার দৃষ্টি সীমানায় নেই তাই তার অস্তিত্ব নেই! বাস্তবে আসলে কেউ এমন করে না। কিন্তু কণা জগতে এমন যুক্তি খাটে। আজকে আলোচনার ব্যাপার হচ্ছে কণার জগতের সেই ভূতুড়ে কাহিনি নিয়েই।

চোখ বন্ধ করুন, আর চিন্তা করুন একই *Wave function*-এর অধীনে দুইটি কণা। এদের স্পিন আমরা ধরি একটির ↑ এবং অন্যটি ↓। এবার আমরা এদের একজনকে নিয়ে অনেকদূরে ভ্রমনে গেলাম প্রায় কয়েক আলোকবর্ষ দূরে তারপর দেখলাম একটির স্পিন ↑ পাওয়া গেলে অন্যটির হবে ↓ সহজ তাই না? এবার আরেকটু অন্যভাবে চিন্তা করি, আমাদের পর্যবেক্ষনের আগে এদের স্পিন কেমন ছিল? এরা তখন সুপারপজিশন অবস্থায় ছিল। এরা একই সাথে সকল পসিবল স্টেটে বিরাজ করছিল অনেকটা একই সাথে বিড়াল মারা ও জীবিত থাকার মতো।

পুরা সিস্টেমকে তখন একটা ফাংশন ধরে লেখা যায়

$$|\psi> = a|\uparrow(A)>|\downarrow(B)> + b|\downarrow(A)>|\downarrow(B)> + c|\uparrow(A)>|\downarrow(B)> + d|\uparrow(A)>|\uparrow(B)>$$

এখানে, A ও B দ্বারা দুটি কণাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। হিসাব করে দুটাই *up* এবং দুটাই *down* সম্ভাবনাকে *cancel* করা যায়। এখানে, *a, b, c, d* এর বর্গ হল |*spin*> এ দুটি ইলেকট্রন ওই দুই অবস্থায় পাওয়ার সম্ভাবনা।

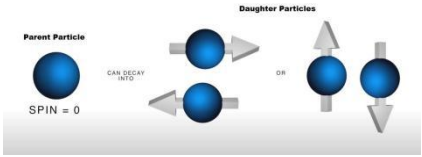

এখন যদি আপনি বলেন, "এটা কীভাবে সম্ভব?" তাহলে বলব আপনি আইন্সটাইনের পথে আছেন। উনিও সেম কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন "*God doesn't play dice with us*"। ওনার এই সকল স্টেটে থাকার সম্ভাবনা ভালো লাগে নি। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রমাণ করে *Local Realism*। *Local Realism* প্রমান করে সব কিছুই *Measure* করা যায় এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর সিস্টেম কেমন আচরণ করবে তা সঠিকভাবে নির্ধারন করা যায়। যেমন আপনি কোনো ছক্কা নিক্ষেপ করলে ছক্কায় কী পড়বে তা বের করা যায়, বিশ্বাস হচ্ছে নাহ? আপনি ছক্কার বেগ, বাতাসের বাধা, কৌনিক বেগ, টর্ক, ঘটনা ঘটার ভিতর যা যা হবে ইত্যাদি সব হিসাব করে বের করতে পারেন ছক্কায় কী পড়বে। কিন্তু বাস্তবে একসাথে নিখুঁতভাবে এত কিছু জানা সম্ভব না। অ্যামাজনে একটা প্রজাতির পাখার বাতাসের প্রভাবে বাংলাদেশে ঝড় হয়ে যাবে কি না বলা যায় না, তাই বলা যায় আমরা ভবিষ্যত মাপতে পারি না। কিন্তু *Quantum Mechanics* এ এই *Local Realism* চলে না। এখানে চলে সম্ভাবনার খেলা। আমরা শুধু সম্ভাবনার মাধ্যমে একটা ধরনা দিতে পারে ইলেকট্রন অরবিটের কোথায় ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা কত। এর ভিত্তিতে পরবর্তীতে *EPR (Einstein Podolsky Rosen)* নামের *Concept* নিয়ে আসলো। এই ব্যাপারটা হল, একই ওয়েভ

ফাংশনের অধীনে থাকা সকল কণার মধ্যে DNA-এর মতো ডাটা এন্ট্রি থাকে। বাকি জীবন দশায় এরা কেমন বিহেভ করবে তা এতে নির্ধারিত থাকে। এতে করে একট কণার দেখার উপর তার জোড়ের অন্য কণার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় না। কারন আগে থেকেই তার ভিতর Encoded করা থাকে সে কি ধরনের আচরণ দেখাবে। যেটাকে বলা হয় *Hidden Variable*। কিন্তু এই থিওরি যে সঠিক নয় তা বেলের অসমতা দিয়ে তা প্রমান করা যায়।

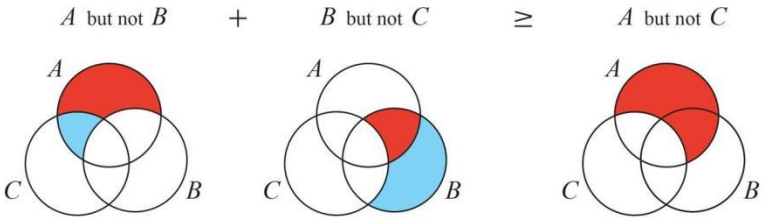

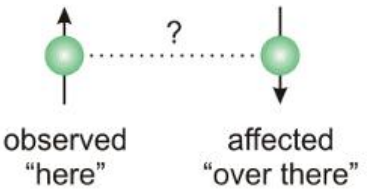

ধরি, A, B, C তিনটি সেট এখানে, সেট যদি এমন হয়

A থাকবে কিন্তু B নয় + B থাকবে কিন্তু C নয় ≥ A থাকবে কিন্তু C নয়

Bell inequality-কে ম্যাথমেটিকালি এভাবে ডিফাইন করা যায়।

এখন ধরি, কোন সোর্স থেকে আমরা দুটা ফোটন তৈরি করছি যারা একই রকমের আচরণ করে ঠিক যেমন আমাদের আগের A এবং B একই ওয়েভ ফাংশনের অধীনে থাকা কণার মতো। আমরা যদি এদেরকে পোলারাইজারের ভিতর দিয়ে দেই তবে কি হবে? ধরি আমরা এমন দুটি পোলারাইজারের ভিতর দিয়ে আলো পাঠাই তবে অপর পাশে কোন ফোটনই বের হবে না। এটা পোলারাইজারের বেসিক একটি

ব্যাপার। আচ্ছা এবার আমরা যদি অনূভুমিকের সাথে 180°, 45°, 90° কোণে পোলারাইজার রাখি তবে দেখব কিছু ফোটন অপর পাশ দিয়ে বের হবে। বাকিগুলোর কী হবে? বাকিগুলো ফিল্টারের মতো 3 টা পোলারাইজারের ভিতর দিয়ে যেতে পারবে না। এভাবে যদি আমরা 90°, 120° এবং 240° তে ৩টি পোলা-রাইজারের ভিতর ১টি ফোটন কত সম্ভাব্য উপায়ে বাধা পায় কিংবা যেতে পারে তার একটি ছক করি তাহলে কেমন হয়?

এই ছকে ফোটনটি কোথায় আটকাতে পারে তার সব সম্ভবনা দেওয়া হল। এখন ছক-২-এর দিকে যদি তাকাই তাহলে সেটা হল দুইজন পর্যবেক্ষক যদি দৈবভাবে দুটা পোলারাইজার চয়েজ করে তবে যদি দুইটা দিয়েই ফোটন যায় কিংবা দুইটা দিয়েই ফোটন না যায় সেই হিসাবকে সেইম হিসাবে ধরে নেই এবং বাকিগুলো ভিন্ন তাই ডিফারেন্ট ধরে নেই।

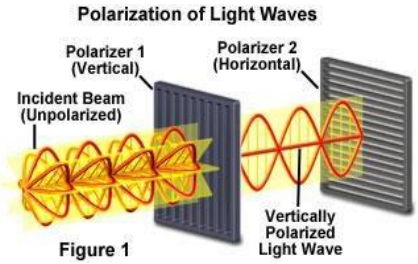

Figure 1

এখন একটু সম্ভাবনার হিসাব করে দেখা যায় 3টাই same এমন row দুইটা বাদ দিলে প্রতিটা row-তে ফোটনের same হওয়ার সম্ভাবনা 1/3 । 3টাই same এমন row বাদ দিব কারন এক্সপেরিমেন্ট করা ২ জনের জন্যই ফলাফল সব same আসবে। যার ফলে ফলাফলে কোন ডিফারেন্স নেই। এখন EPR মতে ফোটনের ভিতর এমন information-এর জন্ম থেকে দেওয়া আছে যে ওই ফোটন সারাজীবন কোন পোলারাইজার দিয়ে যাবে কিংবা যাবে না তা ইনক্লুডেড করা তাই সেই ফোটনগুলা কেমন আচরন করবে আমরা তার ছক একে নিয়েছি। তাই বলা যায় 100 বার পরীক্ষাটি করলে কমপক্ষে 33 বার রেজাল্ট same আসার কথা। কিন্তু আসল কথা হল পরীক্ষা শেষে

দেখা যায় 1/3= 0.33 এর বদলে এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট আছে 0.25 যা "কমপক্ষে 1/3 বার" এর রুলকে ভায়োলেট করে। যার ফলে প্রমানিত হয় EPR এর Hidden variable এর conceptটা ভুল।

Table-1			Table-2		
A(90)	B(120)	C(240)	AB	BC	CA
Passed	Passed	Passed	Same	Same	Same
Passed	Passed	Failed	Same	Diff	Diff
Passed	Failed	Passed	Diff	Diff	Same
Passed	Failed	Failed	Diff	Same	Diff
Failed	Passed	Passed	Diff	Same	Diff
Failed	Failed	Passed	Same	Diff	Diff
Failed	Failed	Failed	Same	Same	Same
Failed	Passed	Failed	Diff	Diff	Same

প্রতিটা ক্ষেত্রে আমাদের same রেজাল্ট পাওয়ার 1/3 আসলে বুঝতাম *Hidden variable* এর মতটি সত্য। কারন আমাদের ছকের প্রতিটি ফোটনকেই আমরা *Local Realism* এর আন্ডারে ধরেই নিয়েছি এটা *particular* ফিল্টারিং এর সময় কেমন আচরন করবে কিন্তু প্রমানিত হল *Quantum mechanics* এ *Local Realism* খাটে নাহ। তাহলে কি এই *Confused* সম্ভাবনার যুক্তিতে কণাজগৎ চলে? উত্তর হলো, 'হ্যাঁ' আমাদের হিসাব এবং প্রমাণ অন্তত তাই বলে। তাহলে আমাদের চিরাচরিত যুক্তি কীভাবে ভুল হয়? কেনো আমাদের মস্তিষ্কের যুক্তিতে ট্রেনের সামনে চোখ বন্ধ করতে যুক্তি দেখায় না? এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। আমি এভাবে ভাবি যে, রিয়েলিটি একটা অনেক বড়ো সেট যার আন্ডারে সাব-সেট হল আমাদের মস্তিষ্কের দেওয়া যুক্তি। আমাদের হিসাবের বাহিরেও আরো অনেক বড়ো যৌক্তিক নিয়ম আছে যা আমরা ম্যাথ দিয়ে ফিল করতে পারি কিন্তু সাধারণ দৈনন্দিনকার যুক্তি দিয়ে নয়।

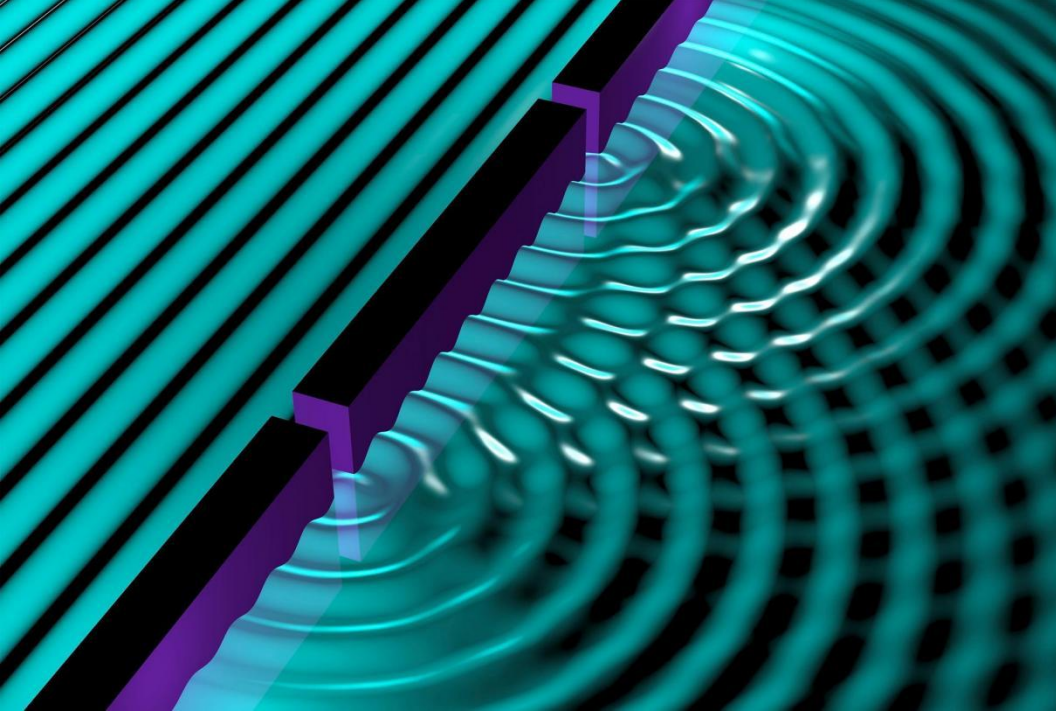

ডিউটেরিয়াম দিয়ে দ্বি-চির পরীক্ষা

টিম ট্যকিয়ন

প্রথমবারের মতো বিজ্ঞানীরা মৌল ব্যবহার করে কোয়ান্টাম লেভেলে দ্বি-চির পরীক্ষা প্রমাণ করলেন। দ্বি-চির পরীক্ষায় সাধারণত দুইটি ছিদ্রের একপাশে আলোক উৎস রাখলে অপরপাশে অনেকগুলো সাদা-কালো ডোরা দেখা যায়। কোয়ান্টাম লেভেলে দেখা যায় একই ঘটনা নানা কণার ক্ষেত্রে। যেমন দুই ছিদ্রের একপাশে ইলেকট্রন নিক্ষেপ করলে অপর পাশে ইলেকট্রনের ডোরা সৃষ্টি হয়। এই একই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে ডিউটেরিয়ামের মৌল (D_2) দিয়ে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Richard Zare, Nandini Mukherjee এবং তাদের সহকর্মীরা এই বিষয়টি প্রমাণ করেছেন।

তথ্যসূত্র -
H Zhou et al, Science, 2021, DOI: 10.1126/science.abl4143

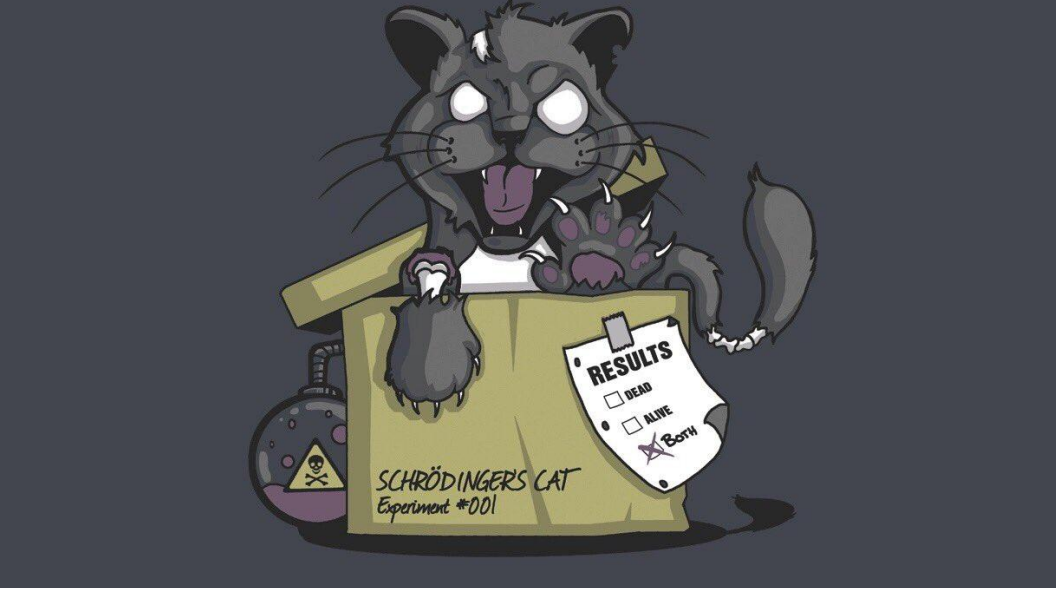

শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল ও কোয়ান্টাম বাস্তবতা

কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ

এরউইন শ্রোডিঙ্গার (Erwin Schrödinger) নামে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি একটা মানস পরীক্ষা করেছিলেন যা ইতিহাসে ‘শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল’ নামে খ্যাত। পরীক্ষাটা এমন -

একটি বাক্সের ভিতর একটি বিড়াল রাখা হয়েছে। সেই বাক্সটি পুরোই অস্বচ্ছ। মানে বাইরে থেকে ভিতরে কী আছে তা দেখা যায় না। আবার ভিতর থেকে বাইরে কী হচ্ছে তা দেখা যায় না। এমন অবস্থায় বিড়ালের সাথে বাক্সের ভিতর রাখা হয়েছে একটি তেজস্ক্রিয় ক্ষয়কারী বস্তু। তেজস্ক্রিয় ক্ষয় মানে এখান থেকে নানা ধরণের কণা বের হয়। ঠিক কোন সময়ে বের হবে তা আসলে আমরা জানি না বা কখনো জানাও যাবে না। এটা পুরাটাই দৈব। এখন ওই তেজস্ক্রিয় বস্তুর ঠিক সামনেই রাখা আছে একটি গাইগার কাউন্টার। গাইগার কাউন্টার এমন একটা যন্ত্র যা তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের ফলে কয়টি কণা বের হয়েছে তা ডিটেক্ট করতে পারে। সেই গাইগার কাউন্টারের সাথে একটি হাতুড়ি লাগানো আছে। আর হাতুড়ির ঠিক নিচেই

রাখা আছে একটি সায়ানাইড বিষের কাঁচের পাত্র। ঘটনা কি হচ্ছে আবার একটু বলি। তেজস্ক্রিয় ক্ষয় হলে একটি কণা বের হবে। সেটা ডিটেক্ট করবে গাইগার কাউন্টার। ডিটেক্ট করলে তা থেকে হাতুড়ি সংকেত পাবে ও বিষ সমৃদ্ধ কাঁচের পাত্রটি ভেঙ্গে দিবে। সায়ানাইড বিষ বাক্সে ছড়িয়ে বিড়াল মারা যাবে।

এখন ব্যাপার হচ্ছে, তেজস্ক্রিয় ক্ষয় ঠিক কখন হবে আমরা সেটা জানি না। ফলে বিড়ালটা কখন মারা যাবে তাও আমরা জানি না। ফলে আমরা যখন বাক্সের বাইরে থেকে দেখছি তখন বিড়ালটি জীবিত না মৃত? এই প্রশ্নটা অনেকের কাছেই অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও শ্রোডিঙ্গারের কাছে মনে হয় নি। উনি বললেন, বিড়ালটি জীবিত বা মৃত তা আমরা যেহেতু জানি না, তাই এই দুই স্টেটকে (জীবিত একটি স্টেট, মৃত আরেকটি স্টেট) একসাথে হিসাব করি। এখান থেকে তিনি জন্ম দিলেন কোয়ান্টাম সুপারপজিশনের।

তিনি বললেন, বাক্সটির দিকে আমরা যখন বাইরে থেকে তাকিয়ে আছি তখন দুইটি জিনিসের সম্ভাবনাই একে অপরের উপর রয়েছে। কোনোটিকেই বাদ দেওয়া সম্ভব না। একে তিনি লিখলেন এভাবে,

$$|\text{বিড়াল}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|\text{জীবিত}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\text{মৃত}\rangle$$

একে বলে ওয়েভ ফাংশন $|\ \rangle$ এর ভিতরে যা আছে তাকে বলে স্টেট। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিড়ালটির জীবিত ও মৃত হওয়ার সম্ভাবনার যোগফল হচ্ছে আমাদের ওয়েভ ফাংশন। অর্থাৎ আমরা বাইরে থেকে যখন দেখছি তখন বিড়ালটি একই সঙ্গে তার জীবিত ও মৃত স্টেট ধারণ করে বসে আছে। তবে আমরা যদি বাক্সটি খুলে ভিতরে দেখি তখন দেখা যায়, বিড়ালটি হয় জীবিত নয় মৃত। অর্থাৎ দুই স্টেটের যেকোনো একটি হয়ে যায়। একে বলে ওয়েভ ফাংশন কল্যাপ্স।

তার মানে একটি বস্তুকে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা পর্যবেক্ষণ করছি ততক্ষণ পর্যন্ত এটির বাস্তবতা কী আমরা বুঝতে পারছি না। কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ থেকেই আমরা একটি বাস্তবতা তৈরি করি। একে বলে 'মেজারম্যান্ট প্রবলেম' আইনস্টাইন ছিলেন শ্রোডিঙ্গারের এই তত্ত্বের ঘোর বিরোধী। তাই তিনি ও তার সাথের দুই বাঘা বিজ্ঞানী, বরিস পোডোলস্কি ও ন্যাথান রোসেন মিলে একটি গবেষণাপত্র লিখেন যার শিরোনাম, *"Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?"* এখানে তারা তিনজন মিলে একটি প্যারাডক্সের জন্ম দেন যা ইতিহাসে ইপিআর প্যারাডক্স নামে বিখ্যাত। ইপিআর নিয়ে আরেকদিন আলোচনা করা যাবে। তবে আমাদের আজকের আলোচনা আরো রহস্যময়ী।

শোডিঙ্গারের বিড়াল মানস পরীক্ষার পরে আরেকজন বিজ্ঞানী ইউজিন উইগনার আরেকটি মানস পরীক্ষা করেন। উইগনার একটি রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। রুমের ভিতরে রয়েছেন উইগনারের বন্ধু। রুমের ভিতরে থেকে উইগনারের বন্ধু একটি কণা পর্যবেক্ষণ করছেন। এখন রুমটাও শোডিঙ্গারের বিড়ালের বাক্সের মতো অস্বচ্ছ। বাইরে থেকে ভিতরে কী হচ্ছে তা দেখা যায় না, আবার ভিতর থেকে বাইরে কী হচ্ছে দেখা যায় না। এখন উইগনারের বন্ধু যেহেতু কণাকে পর্যবেক্ষণ করছে তাই উইগনারের বন্ধুর সাপেক্ষে কণার ওয়েভ ফাংশন কল্যাপ্স করা আছে। মানে কণাকে সে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দেখতে পাচ্ছে। অন্যদিকে উইগনার যেহেতু রুমের বাইরে তাই তার জন্য কণাটির ওয়েভ ফাংশন তখনো কল্যাপ্স করেনি। ফলে উইগনারের সাপেক্ষে কণাটি তার সম্ভাব্য সকল স্টেট ধরে বসে রয়েছে। মানে উইগনারের জন্য কণাটির সুপারপজিশন ঘটছে কিন্তু তার বন্ধুর জন্য কণার সুপারপজিশন হচ্ছে না। এটা কেমন? দুইজনই মানুষ। দুইজনই একই সময়ে

কণাটির স্টেট জানতে চাচ্ছে। কিন্তু একজনের হিসাব একরম আরেকজনের আরেকরকম। মানে উইগনার যদি নিজে তার বন্ধুকে পর্যবেক্ষণ না করে তাহলে উইগনারের বন্ধুর করা পর্যবেক্ষণও বাস্তব হবে না, আবার উইগনারের বন্ধুর নিজেরই বাস্তব অস্তিত্ব থাকবে না।

তাহলে বাস্তবতা কি ব্যক্তিভেদে আলাদা? ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু হলো না। উইগনার যেহেতু রুমের ভেতরে থাকা তার বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছে না, তাই তার বন্ধুও সকল সম্ভাব্য ওয়েভ ফাংশন নিয়ে বসে আছে। তাহলে উইগনারের বন্ধুও এখন উইগনারের সাপেক্ষে আলাদা জিনিস হয়ে গেল। এই পরীক্ষা থেকে উইগনার বললেন, বাস্তবতা আসলে একটা বিভ্রম। প্রত্যেকের জন্য বাস্তবতা আলাদা।
এখন এটার অনেক ফিলসফিক্যাল ঝামেলা আছে। তাই দার্শনিক ও কগনিটিভ সায়েন্টিস্ট ডেভিড চালমার্স বলেন,

“কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ভিত্তি গঠন করেছেন এমন অনেক লোকই উইগনারের এই ধারণাকে ভূতুড়ে ও দুর্বল বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কারণ এর ফলে একজন পর্যবেক্ষক স্পেশাল কিছু বৈশিষ্ট্য পেয়ে যায়।”

তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে বাস্তবতাবিরোধী এই মানস পরীক্ষা গতবছর এবং এইবছরে করা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা থেকে বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। কি আজব না? আমরা আমাদের আশেপাশের জগতকে কেমন জানি অথচ ‘বাস্তবে’ তা কেমন! কতই অদ্ভুত এই মহাবিশ্ব।

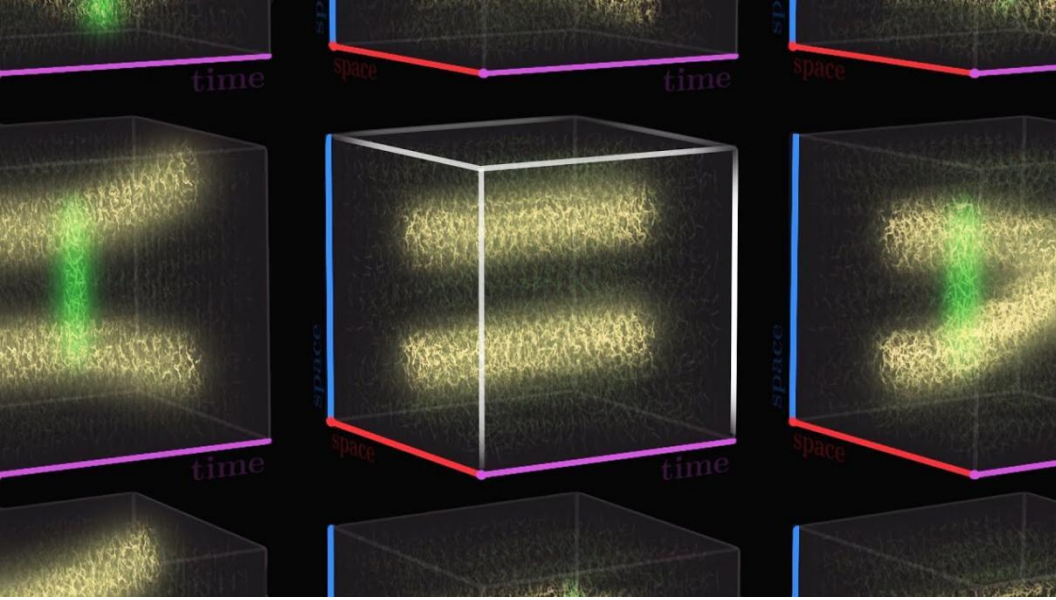

ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম ও পাথ ইন্টিগ্রাল

রুশলান রহমান দীপ্ত

মাছ-মাংস কিনতে হবে। বাজারে যাবেন। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছেন কী দিয়ে যাওয়া যায়। আপনার হাতে অনেকগুলো অপশন। রিকশা, বাস, অটো স্বভাবতই যে বাহনে আপনার টাকা কম লাগবে সেই বাহনে আপনি চড়ে বসবেন। বিষয়টাকে একটু কোয়ান্টাম লেভেলে নিয়ে যাই।

ধরুন ক্লাসে স্যারের লেকচার ভালো লাগছে না, কিছু একটা করতে মন চাচ্ছে। আপনার ঠিক সামনে বসে থাকা ফার্স্ট বেঞ্চে বন্ধুটিকে খোঁচানোর জন্য একটি ইলেকট্রন শুট করলেন। আপনাকে মনে রাখতে হবে ইলেকট্রন, বল বা কাগজের গোলার মত ম্যাক্রোস্কপিক কোন বস্তু নয়। এটি অতি সূক্ষ্মবস্তু আর এর গতিবিধি নির্ধারণ করে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সবকিছুই সম্ভাবনা নির্ভর। একটি বস্তু একইসাথে অনেকগুলো স্টেটে থাকতে পারে, একই সময়ে স্থানের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান করতে পারে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নিয়ম

অনুসারে। ঠিক সেই কারণে ইলেকট্রনটি আপনার বন্ধুর মাথায় লাগাটাও সম্ভাবনা নির্ভর। ইলেকট্রনটি আপনার বন্ধুর মাথায় সরল পথে গিয়েও লাগতে পারে। আবার আপনার বাড়ির হয়ে গিয়েও লাগতে পারে। আবার প্রথমে চাঁদে গিয়ে তারপর আপনার বন্ধুর মাথায় এসে লাগতে পারে।

কিন্তু সম্ভবনার খেলা ঠিক রাখতে গিয়ে ইলেকট্রনটির শক্তির সংরক্ষণশীলতার নীতি ভাঙতে হবে। আপনিতো আর অতটুক শক্তি ইলেকট্রনকে দেননি যে তা চাঁদ থেকে ঘুরে আসবে। ঠিক একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানীরা। তাদের একদিকে ছিল সম্ভাবনার সংরক্ষণশীলতা আরেকদিকে ছিল শক্তির সংরক্ষণশীলতা। এ সমস্যার সমাধান করেন বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান তার পাথ ইন্টিগ্রাল ম্যাথডের সাহায্যে।

পাথ *(Path)* অর্থ রাস্তা এবং ইন্টিগ্রাল *(Integral)* অর্থ যোগজীকরণ। ফাইনম্যান দেখিয়েছিলেন ইলেকট্রন আসলে অন্যকোনো রাস্তায় না বরঞ্চ সরলরেখায় যাবে। আর সরলরেখায় যাওয়ার কারণ হচ্ছে পদার্থের "অ্যাকশন *(Action)*" নামক ভৌতরাশির হ্রাস করার প্রবণতা। পদার্থ সেই রাস্তায় যাবে যে রাস্তায় অ্যাকশন এর পরিমাণ সবচেয়ে কম হয়। ঠিক আপনি যেমন বাজারে যাওয়ার সময় কম টাকা খরচ হবে এমন বাহনের চড়ে ছিলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে অ্যাকশনটা আবার কী? অ্যাকশন হচ্ছে গতিশক্তি এবং বিভবশক্তির বিয়োগফল। এই অ্যাকশন এর উপর দাঁড়িয়ে আছে পুরো একটি বলবিদ্যা যার নাম লাগরাঞ্জিয়ান মেকানিক্স *(Lagrangian mechanics)*। যাই হোক যদি আপনি হিসাব করেন তাহলে দেখবেন যে ইলেকট্রনটি সরলরৈখিক পথে গেলেই এর জন্য অ্যাকশন এর মান সবচেয়ে কম হবে। এভাবে রিচার্ড ফাইনম্যান কণার জন্য বৈধ ও গমনযোগ্য সকল পথকে একটি নির্দিষ্ট পথে সংজ্ঞায়িত করে দিলেন।

এ তো গেল পাথ ইন্টিগ্রাল-এর কথা।

ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম কী জিনিস?

একটি কণা অপর একটি করার সাথে কীভাবে মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তা আমরা জানতে পারি এই ডায়াগ্রামের সাহায্যে। একটি অতিপারমাণবিক কণার স্পেস দিয়ে গমনকালে বিভিন্ন ধরনের মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ওই ইলেকট্রনকে যখন আপনি আপনার বন্ধুর মাথা বরাবর শুট করেছিলেন সেই কণাটি তার চলনকালে অনেকধরনের মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারত। যেমন : সেটি একটি ফোটন ত্যাগ করতে পারত বা আরেকটি পজিট্রন-এর সাথে যুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ ফোটন তৈরি করতে পারত। এই সকল বিশেষক্রিয়ার গ্রাফিক্যাল প্রদর্শনী হচ্ছে ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম।

কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিতে যেখানে প্রত্যেকটি কণাকে তার সাথে সংশ্লিষ্ট ফিল্ডের ভাইব্রেশন হিসেবে প্রকাশ করা হয় সেখানে একটি কণা চলনকালে সম্ভাব্য সকল ধরনের মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে বা করে থাকে। যেমন ধরুন কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির একটি বিশেষ অংশ কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস। যেখানে ইলেকট্রন ফিল্ডের সাথে ফোটন ফিল্ডে মিথস্ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেখানে ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম ব্যবহার করে আমরা ইলেকট্রন-ইলেকট্রন বিকর্ষণ অথবা ইলেকট্রন-প্রোটন এর আকর্ষণ ব্যাখ্যা করতে পারি। যেমন একটি ইলেকট্রন অপর একটি ইলেকট্রনের কাছাকাছি আসলে এদের মধ্যে ভার্চুয়াল ফোটনের বিনিময় হয়। এর ফলে একটি ইলেকট্রন অপর ইলেকট্রনকে বিপরীতমুখী ভরবেগ প্রদান করে।

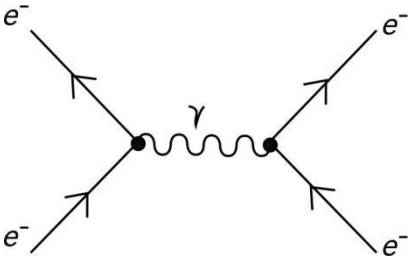

তাই আমরা একটি ইলেকট্রনকে অপর ইলেকট্রন বিকর্ষণ করতে দেখি। আকর্ষণ বল ঠিক তেমনি কিন্তু এখানে ঋনাত্বক ভরবেগ বিনিময় হয়। ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম-এর কিছু বৈশিষ্ট্য হলো :

১. একটি দ্বিমাত্রিক ডায়াগ্রাম যার দুই অক্ষ বরাবর একটি দ্বারা সময় আর একটি দ্বারা স্থান প্রকাশ করা হয়।

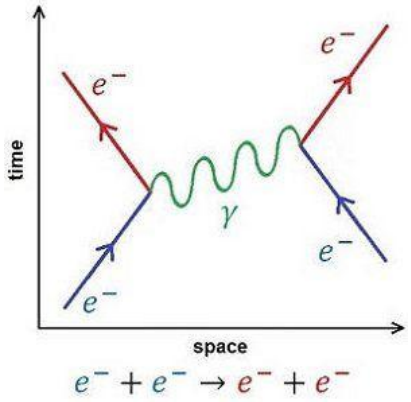

২. সময়-এর বিপরীতে চলমান কণাগুলো সেই কণার প্রতিকণা হিসেবে প্রকাশ পায়।

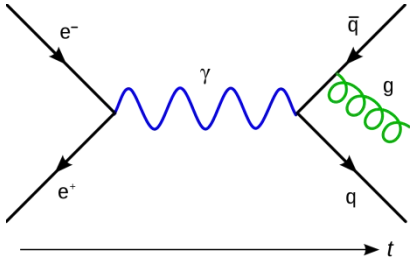

৩. এই ডায়াগ্রাম প্রতিসমতা বজায় রাখে। যেমন x অক্ষ এবং y অক্ষ প্রতিস্থাপিত করলে ডায়াগ্রামের বিশেষ কোনো পরিবর্তন আসে না।

৪. তিনটি রেখার ছেদবিন্দুকে Vertex বলা হয়।

৫. পরিচিত স্ট্যান্ডার্ড মডেলের প্রায় সকলধরনের কণার মিথস্ক্রিয়াগুলো এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

আসলে ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম হচ্ছে একটি বিশেষধরনের কৌশল যার দ্বারা জটিল গাণিতিক সমীকরণ-গুলোকে চিত্র আঁকারে সহজ ভাবে প্রকাশ করা যায়। এই ডায়াগ্রামের প্রধান শর্ত হচ্ছে যে সংরক্ষণশীলতার

নীতিগুলো এই ডায়াগ্রাম মেনে চলে। যেমন : চার্জ-এর সংরক্ষণশীলতা, স্পিনের সংরক্ষণশীলতা, শক্তির সংরক্ষণ-শীলতা ইত্যাদি। একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রন যুক্ত হয়ে কখনও প্রোটনের জন্ম দিতে পারে না।এতে প্রায় সকল সংরক্ষণশীলতার নীতিই লঙ্ঘন করা হয়।

এই ডায়াগ্রাম-এর সবচেয়ে বড়ো সফলতাগুলো হচ্ছে ভার্চুয়াল পার্টিক্যাল-এর উদ্ভাবন, বিগব্যাং-এর পর ম্যাটার-আন্টিম্যাটার-এর অ্যাসিমেট্রির কারন ব্যাখ্যার চেষ্টাসহ আরো অনেক। প্রথমটির কথা বলতে গেলে, প্রকৃতির শুন্যস্থান মনে হওয়া স্থানগুলোতে ভার্চুয়াল পার্টিক্যাল-এর জন্ম হতে থাকে হরহামেশাই। এগুলো বস্তু জগতের নিয়ম-কানুন মেনে চলে না। যেমন : এরা আলোর বেগের চেয়ে দ্রুত চলতে পারে এমন কি অতীতেও ভ্রমন করতে পারে। এদের সৃষ্টির কারন ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম দিতে পারে। কারনস্বরুপ বলা যায় ফোটন তার চলনকালে যে সকল ইন্টারেকশনে অংশ নেয় তাই ভার্চুয়াল পার্টিক্যাল-এর সৃষ্টির জন্য দায়ী।

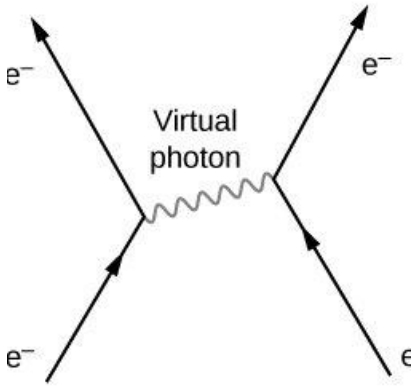

আবার বিগব্যাং-এর সময় সম পরিমান ম্যাটার এবং আন্টিম্যাটার তৈরি হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা শুধু ম্যাটারই দেখতে পাই কেনো? এর উত্তরে বলা যায়, আন্টিম্যাটার টাইমের উল্টা দিকে চলে। তাই অন্য আরেকটি মহাবিশ্ব হয়ত বিগব্যাং-এর সময় সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে সময় বিপরীতে চলে। আর সকল আন্টিম্যাটার সেই মহাবিশ্বেই আছে।

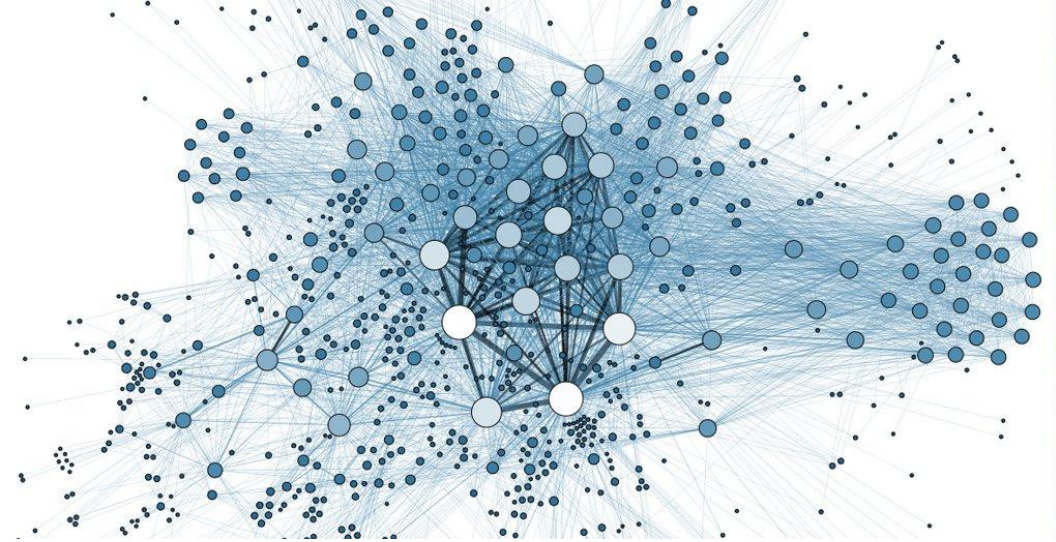

ডেটা সায়েন্স : মেথডলজি ও অ্যাপ্রোচ কি? কেন? কীভাবে?

আজমাইন তৌসিক ওয়াসি

ডেটা সায়েন্স বলতে আমরা কী বুঝি, এখন কেনো এটা এত গুরুত্বপূর্ন– এগুলো আমরা আগের পর্বে জেনেছি। ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে হলে, এবার আমাদের জানা উচিত যে, ডেটা সায়েন্স কীভাবে কাজ করে? বা এর মূলনীতি বা প্রিন্সিপালসগুলো কী কী? কোন কোন জিনিসগুলো আমাকে অনুসরণ করতে হবে, যদি আমি একজন ভালো ডাটা সায়েন্টিস্ট হতে চাই বা একটা প্রজেক্ট থেকে ভালো আউটপুট বের করে আনতে চাই?

এ পর্বে আমরা ডেটা সায়েন্সের মেথলজি নিয়ে আলোচনা করবো, প্রসেস নিয়ে আলোচনা করবো; যাতে একটা প্রজেক্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটা স্টেপ আমরা ভালোভাবে নিতে পারি। পাশাপাশি ডেটা সায়েন্স ব্যবহার করে কীভাবে একটা ব্যবসা বা রিসার্চ উপকৃত হচ্ছে তা অনেক কাছ থেকে দেখতে পারি।

ডেটা সায়েন্স মেথডলজি

মেথডলজি হলো, একটা নির্দিষ্ট টপিকে কাজ করার জন্য যেসব প্রিন্সিপালস (মূলনীতি) ও তার প্রসেসগুলার একত্রে কাজ করার একটা সিস্টেম। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি রিসার্চ করতে যাই, রিসার্চের সময় আমাদেরকে বেশ কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে। প্রতিটা স্টেপ কীভাবে হচ্ছে, কেনো হচ্ছে, কী কী করা যাবে, কী কী করা যাবে না, কী কী করা উচিত, কী কী করা উচিত না - এসব। আর এ সবগুলো মিলিয়েই হয় রিসার্চের মেথডলজি। এমনই ডাটা সায়েন্সের বিষয় নিয়ে হচ্ছে ডেটা সায়েন্স মেথডলজি।

যারা ডেটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করে, তাদের সামনে প্রতিদিনই নানারকম সমস্যা দেওয়া হয়। প্রদত্ত তথ্য অ্যানালাইসিস করে যার সমাধান করতে হয়। আর এ কাজে একজন ডেটা সায়েন্টিস্ট প্রতিনিয়তই ডেটা সায়েন্স মেথডলজির সাহায্য নেন। এর সাহায্য নিয়ে তিনি একটা সমস্যাকে ভালোভাবে বুঝেন ও সমাধান করার পথ খুঁজেন। এ মেথডলজি সবরকম সহজ-জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য রুটিনের মতো কাজ করে। এখন এটা নিয়ে আলোচনা করব :

১। বিজিনেস আন্ডারস্ট্যান্ডিং

কোনো একটা সমস্যা সমাধানের আগে, এটার বিজনেস ডোমেইন আমাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। বিজনেস ডোমেইন বলতে যে টপিকে আমি কাজ করব, যে বিষয়ের প্রবলেম সলভ করব তা; যেমন – মার্কেটিং প্রবলেম হলে মার্কেটিং, বায়োইনফরমেটিক্স হলে সংশ্লিষ্ট টপিক যেমন – এপিডেমিওলজি হতে পারে, ক্যান্সার সংক্রান্ত হতে পারে, জিনোম বা জেনেটিক কোড হতে পারে; আমাকে সেটা নিয়ে পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে। বিজনেস আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকলে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবো যে, আমাকে কোন কোন প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করতে হবে; এক্সাক্টলি কোন

প্রবলেমটা আমাকে সলভ করে কী রকম সমাধান বের করতে হবে। সহজে বললে, বিজনেস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো, সে টপিকে ভালো ডোমেইন নলেজ থাকা ও সে নলেজের সাহায্যে প্রবলেমটা ফিল করতে পারা।

আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করি, যেমন আমরা আমাদের দেশের নারী-পুরুষের আয়ের একটা অ্যানালাইসিস করব। এক্ষেত্রে আমার ডোমেইন নলেজ কী? ইকোনমি কীভাবে কাজ করে, আমাদের দেশের সোশ্যাল স্ট্রাকচার ও আয়ের সাথে কি কি ফ্যাক্টর রিলেটেড – এসব জানতে হবে। তারপর আসবে, আমি আসলে কী বের করতে চাচ্ছি? যেমন এক্ষেত্রে আমি অ্যানালাইসিস করে পারিপার্শ্বিক নানা ফ্যাক্টরের সাথে মানুষের আয়ের সম্পর্ক বের করব।

২। অ্যানালাইটিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং

বিজনেস আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর পর আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে, এ টপিক নিয়ে কাজ করার সময় আমরা কোন অ্যানালাইটিক অ্যাপ্রোচ ফলো ও মেইনটেইন করব। এটাও অনেকটা প্রবলেম ও যে টাইপ সলিউশন দেয়া আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে।

অ্যানালাইটিক অ্যাপ্রোচ প্রধানত ৪ রকমের।

ডিস্ক্রিপ্টিভ অ্যাপ্রোচ *(Descriptive approach)*

এ অ্যাপ্রোচে প্রধানত প্রদত্ত ইনফরমেশন অ্যানালাইসিস করে বিজনেসের বর্তমান স্ট্যাটাস বের করা হয়; বিজনেস কীভাবে পারফর্ম করছে, কোন কোন ডেটা কী নির্দেশ করছে– এ জাঁতীয় তথ্য বের করা হয়। এটা প্রধানত গ্রাফ, চার্ট, রিপোর্টের মাধ্যমে প্রেজেন্ট করা হয়।

ডায়াগনস্টিক এপ্রোচ *(Diagnostic approach)*

এ অ্যাপ্রোচে স্টাটিসটিকসকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রদত্ত ডাটার প্রায়

সব রকম স্টাটিসটিক্যাল অ্যানালাইসিস করে কী হচ্ছে, কেনো হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে – এসব বের করা হয়; যেমনি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নানা পরীক্ষা করে আমাদের রোগ বের করা হয় তেমনি।

প্রেডিক্টিভ অ্যাপ্রোচ
(Predictive approach)

এ অ্যাপ্রোচে প্রধানত মেশিন লার্নিং ও নানারকম অ্যানালাইটিক্যাল টুল ব্যবহার করে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। ফিউচার ট্রেন্ড, ফিউচার ইভেন্ট প্রিডিকশন করা হয় এ অ্যাপ্রোচে। কোনো বিজনেসে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ভবিষ্যতে কী হতে পারে, কেনো হতে পারে, কীভাবে সমাধান করা যেতে পারে - এসব জানতে এ ধরনের অ্যানালাইসিস করে থাকে।

প্রেসক্রিপ্টিভ এপ্রোচ
(Prescriptive approach)

এ অ্যাপ্রোচে প্রবলেম সলভিং-কে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। কীভাবে একটা জটিল সমস্যা সমাধান করা যায় এ নিয়ে কাজ করা হয় এখানে। বিজনেসের কী করা উচিত, কীভাবে করা উচিত, কেনো করা উচিত - এ ধরনের সিদ্ধান্ত দিয়ে সাহায্য করে এ ধরনের অ্যানালাইসিস। অনেকটা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেয়ার মতো।

আমাদের আয়ের অ্যানালাইসিসের জন্য অ্যানালাইটিক অ্যাপ্রোচ ঠিক করব এবার। এজন্য আমরা প্রেডিক্টিভ অ্যাপ্রোচ বেছে নিতে পারি। কেনো? আমরা সব ফ্যাক্টর মাথায় রেখে একজনের আয় কত হতে পারে – এ জিনিসটা প্রেডিক্ট করার চেষ্টা করব। তাহলে কোন ফ্যাক্টরটা বেশি ইফেক্টিভ হচ্ছে, আর কোনটা কম। সেটা আমরা সহজেই বুঝতে পারব। পাশাপাশি, একজনের সমগ্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শিক্ষা ও পারিবারিক অবস্থান থেকে তার আয় কেমন হতে পারে বা হওয়া উচিত, সেটা বের করতে পারব। এতে দুর্নীতির মতো বিষয়গুলোও আমরা বুঝতে পারব।

৩। ডেটা রিকোয়ারমেন্টস *(Data Requirements)*

প্রবলেমের স্ট্রাকচার ও অ্যাপ্রোচ বুঝার পর বের করতে হবে যে কী কী ডাটা আমার প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আরো কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে। যেমন ডেটা কন্টেন্ট, ডেটা কোন ফরম্যাটে আছে এবং ডেটার সোর্স কী। ডেটা রিকোয়ারমেন্টস সেট করার সময় আমরা কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজব - কী? কোথায়? কখন? কেনো? কীভাবে? এবং কে? এভাবে আমরা সবগুলো প্রশ্নে উত্তর অনুযায়ী ডাটা খুঁজব ।

আমাদের আয়ের অ্যানালাইসিসের জন্য ডেটা রিকোয়ারমেন্টস কী কী হতে পারে? একটা মানুষের সোশ্যাল স্ট্যাটাস, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড, তার পড়াশুনার অবস্থা – এসব ডেটা আমাদের প্রয়োজন হবে। ডেটা ফরম্যাটের জন্য, সোশ্যাল ও পারিবারিক স্ট্যাটাস কে আমরা ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা হিসেবে নিতে পারি, বর্তমান আয় হতে পারে নিউমেরিক্যাল, পড়াশুনার অবস্থাও ক্যাটাগরিক্যাল। এভাবে ডেটা রিকোয়ারমেন্টস ঠিক করব আমরা।

৪। ডেটা কালেকশন *(Data Collection)*

ডেটা কালেকশন হচ্ছে ডেটা রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী তথ্যগুলো সংগ্রহ করা। ডেটা কালেকশনের সময়, ডেটা কোয়ালিটির উপর খেয়াল রাখতে হবে, যথাসম্ভব কম বায়াস (বায়াস হচ্ছে নিরপেক্ষতা ভেঙ্গে একপেশে হয়ে যাওয়া) রাখতে হবে, প্রোপারলি কালেক্টেড হতে হবে। যেমন, আমি যদি মুসলিম পরিবারব্যবস্থা দিয়ে কাজ করতে চাই, আর অন্য ধর্মের মানুষদের থেকে ডেটা নেই, তাহলে সেটা কি আর ইফেক্টিভ হচ্ছে? এমন দিকগুলো মাথায় রাখতে হবে।

যেমন আমাদের অ্যানালাইসিসের বেলায়, নারী পুরুষদের আয়ের

একটা অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে ১০,০০০ জনের ডেটা নিলাম, যেখানে ৮,০০০ ডেটাই পুরুষের, তাহলে নারীদের বিষয়টা কী আমরা প্রোপারলি জাজ করতে পারব? না। তাই আমাদেরকে ঠিকভাবে সব ধরনের সব শ্রেণি-পেশার মানুষদের থেকে পর্যাপ্ত ডেটা আনতে হবে।

৫। ডেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং *(Data Understanding)*

ডাটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে ডেটা কী নির্দেশ করছে সেটা বুঝতে পারা। এক্ষেত্রে বড়ো প্রশ্ন হচ্ছে, আমার কালেক্টেড ডাটা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে কি না? যদি উত্তর না হয়, তাহলে প্রয়োজনে আবার রিকোয়ারমেন্টস অ্যাডজাস্ট করে ডেটা কালেক্ট করতে হবে।

আমাদের উদাহরণে বললে, কালেক্টেড ডেটা থেকে যদি এমন কিছু হয় যে আমরা তেমন ক্লাসিফাই করত পারছি না বা ডেটায় কোনো প্যাটার্ন পাচ্ছি না, তখন আমরা বুঝব যে ডেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে না। ডেটা কো-রিলেশন (দুইটা ডেটার পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা), কো-কজেশন (দুইটা ডেটা রিলেটেড হবার কারণ যৌক্তিক কি না? যেমন, শীতকালে আমরা রঙ্গিন কাপড় পড়ি, আবার, অতিথি পাখি আসে দেশে। এখন দুটোর মধ্যে রিলেশন আছে – শীতকাল। কিন্তু আমাদের রঙ্গিন কাপড় পড়ার কারণে কি পাখি আসে? অবশ্যই না!) ঠিকভাবে হচ্ছে কি না, এসব আমরা দেখবো, বুঝার চেষ্টা করব ডেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ ।

৬। ডেটা প্রিপারেশন *(Data Preparation)*

এটা ডেটা সায়েন্সের সবচেয়ে বড়ো, সময় সাপেক্ষ এবং বিরক্তিকর স্টেপ। ডেটা প্রিপারেশন বলতে, কালেক্টেড ডেটাকে (*Raw Data*) প্রসেস করে ব্যবহার উপযোগী করাকে বোঝায়। মজা করে বলা হয়, ডেটা সায়েন্টিস্টরা ৬০% সময় পার করে ডেটা প্রিপেয়ার করতে আর বাকি ৪০% সময় ব্যয় করে ডেটা

কীভাবে প্রিপেয়ার করবে, সেটা বুঝতে! কথাটা পুরোপুরি ফেলনা নয়, বরং অনেকাংশেই সত্যি।

এ পার্টটা আমরা একটু ডিটেইলে দেখব।

ডেটাতে অনেকরকম সমস্যা থাকতে পারে যেগুলো ঠিক না করলে আমরা পরে ঠিকমত রেজাল্ট পেতে নাও পারি। কী কী সমস্যা থাকতে পারে?

(ক) অ্যাকুরেসি (*Accuracy*) : ডেটা এন্ট্রি বা কালেকশনের সময় অনেক ভুল হতে পারে। কেউ কেউ ভুল ডেটা দিতে পারে। যেমন একজন রিকশাচালক যদি বলে তার আয় ২ লক্ষ টাকা – সেটা নরমাল না। এসব জিনিস দেখতে হব। ডেটা যে ফরম্যাটে নেয়ার কথা, কোনো কোনো ডেটা সে ফরম্যাটে নাও থাকতে পারে। যেমন জন্মদিনের জন্য আমাদের প্রদত্ত ফরম্যাট হলো দিন-মাস-সাল; কিন্তু কয়েকজন সাল-মাস-দিন এই ফর্মেটে ডেটা দিল। এগুলো ডেটার অ্যাকুরেসি কমাবে।

খ। অসম্পূর্নতা *(Lack of Completeness)* : ধরি, অনেকে জন্মদিনের ঘরে কোনো ডেটাই দেয়নি। এখন ডেটায় যে সমস্যাটা হলো তা হচ্ছে অনেক খালি ফিল্ড আছে, কোনো ডেটা নেই এমন। এটাকে বলে, অসম্পূর্ণতা।

গ। ধারাবাহিকতার অভাব *(Inconsistency)* : কিছু কিছু ডেটা ট্রেন্ডের বাইরে যাবে, তবে খুব বেশি ডেটা ট্রেন্ডের বাইরে গেলে সেটা থেকে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে না। এমন ডেটা পেলে এগুলো ঠিক করা লাগবে।

আবারে আসি কীভাবে সমাধান করা যায় এসব সে উপায়গুলো নিয়ে। এ কাজটা স্টেপ-বাই-স্টেপ করা হয়।

ক। ডেটা ক্লিনিং : সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও হতাশাজনক পার্ট। বাজে ডাটা, এবং মিসিং ডাটার বিষয়গুলা সমাধান করা হয় আগে।

>>> মিসিং ডেটা নিয়ে দুভাবে কাজ করা হয়, প্রথমত, পুরোটা সেকশন বা রো বাদ দেয়া। যেমন, তুমি যদি জন্মতারিখ ভুলে না দাও তাহলে তোমার প্রদত্ত সব ডেটা ক্যান্সেল! কিন্তু এভাবে করলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডেটাও বাদ চলে যেতে পারে। তাই আরেকটা পদ্ধতি হলো, **ডেটা ফিলাপ** করা। এক্ষেত্রে গড়, সবচেয়ে বেশি আছে এমন ভ্যালু বা কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল ভ্যালু দিয়ে মিসিং ডেটা ফিলাপ করা হয়। আমরা যে লাইব্রেরি ব্যবহার করব, সেখানে কাজ অটোমেটিক্যালি করার ব্যবস্থা আছে।

>>> বাজে ডেটা হলো এমন ডেটা যেগুলা আমাদের কোনো কাজে তো লাগবেই না, বরং মেশিন লার্নিং প্রসেসকে ডিস্টার্ব করবে। এদেরকে পার্ট পার্ট করে কাজ করে **(বিনিং মেথড)**, রিগ্রেশন বা ক্লাস্টারিং করে ঠিক করা হয়।

খ। ডেটা ইন্টিগ্রেশন : ডেটা অনেক সোর্স থেকে কালেক্ট করা হয়, বাস্তব জীবনে। তাই সব ডেটাকে একত্র করাও একটা জরুরি কাজ। এটা ৩ ধাপে করা হয়, *Data consolidation* (ডেটা ফিজিক্যালি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এনে একত্র করা) *Data propagation* (এক জায়গা থেকে কপি করে আগের জায়গায় নেয়া), *Data virtualization* (সব ডেটা একই ইন্টারফেসের ভিতরে আনা, যাতে একটা এক্সেসের মাধ্যমেই সব ডেটা দেখা যায়)

গ। ডেটা ট্রান্সফরমেশন : ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য এপ্রোপিয়েট ফর্মে আনা হয় ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে। এটারও অনেকগুলো পদ্ধতি আছে।

>>> নরমালাইজেশন : সব নিউমেরিক্যাল ডেটা কে -1 থেকে 1 এর মধ্যে ট্রান্সফার করার পদ্ধতিকে

নরমালাইজেশন বলে। বেশ কয়েকটা উপায়ে করা যায়। বেশিরভাগ লাইব্রেরিতে এটা অটোমেটিক্যালি করা যায়, ফাংশন-মেথড আছে। অনেক বড়ো নাম্বারের বদলে ছোটো সংখ্যায় অনেক অ্যালগরিদম ভালো কাজ করে, তখন এটা বেশ কাজে লাগে।

>>> অ্যাট্রিবিউট সিলেকশন : ডেটা থেকে নতুন নতুন ইনফরমেশন বের করা হয়। যেমন, জন্ম-মৃত্যু তারিখ থেকে বয়স বের করা যায়।

>>> ডিস্ক্রেটিজেশন : Raw value-কে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিউমেরিক্যাল ডেটায় কনভার্ট করা হয়। যেমন আমি ডেটা কালেক্ট করলাম প্রিয় খেলা কার কী, তারপর ক্রিকেট হলে ১, ফুটবল হলে ২, এভাবে সাজালাম, যাতে কম্পিউটার কাজ করতে পারে।

>>> কনসেপ্ট হায়ারার্কি জেনারেশন : ডেটার পরিমাণ বেশি হলে এটা করা হয়। যেমন সারা বিশ্বের ডেটা নিয়ে কাজ করার সময়, আমি আলাদাভাবে ঢাকা-চট্টগ্রাম নিয়ে কাজ না করে সরাসরি এদেরকে 'বাংলাদেশ'-এ কনভার্ট করে কাজ করতে পারি। এভাবে লো থেকে ডেটাকে হাই লেভেলে নেয়াই হলো কনসেপ্ট হায়ারার্কি জেনারেশন।

ঘ। ডেটা রিডাকশন : বেশি ডেটা নিয়ে কাজ করতে বেশি কম্পিউটেশনাল পাওয়ার লাগে। তাই ডেটা থেকে মিনিংফুল পার্ট কালেক্ট করে কাজ করা হয় প্রাথমিক লেভেলে। এর জন্য ডেটা রিডাকশন (কমানো) করা হয়।

এভাবে ডেটা প্রিপেয়ার করা হয়! কাজ করার সময় আমরা প্রায়ই এ সমস্যাগুলো দেখবো এবং এসব স্টেপ ব্যবহার করে সমাধান করব।

৭। মডেলিং *(Modelling)*

এটা হচ্ছে সবচেয়ে অ্যাক্সাইটিং পার্ট। প্রয়োজনীয় মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে মেশিন লার্নিং মডেল তৈরি করা হয়। শুধু তৈরিই না, মডেল টিউনিং (বিভিন্ন প্যারামিটার অ্যাডজাস্ট করে বেস্ট পারফরমেন্স বের করে আনা - এটাও বেশ প্যারাদায়ক। অনেকটা ফোন কেনার পর আমরা সেটিংসগুলো আমাদের সুবিধামতো চেঞ্জ করে নেই না? এমন) করে ভালো আউটপুট বের করা হয়। ভবিষ্যতে সব ঠিক থাকলে আমরা অনেক মেশিন লার্নিং মডেল বানাবো!

নানারকম মডেল আছে। সুপারভাইজড, আন-সুপারভাইজড, ডিপ লার্নিং, নিউরাল নেটওার্ক, রিগ্রেশন, ক্লাসিফিকেশন – অনেক। এসব নিয়ে বিস্তারিত থাকবে পরের পর্বে!

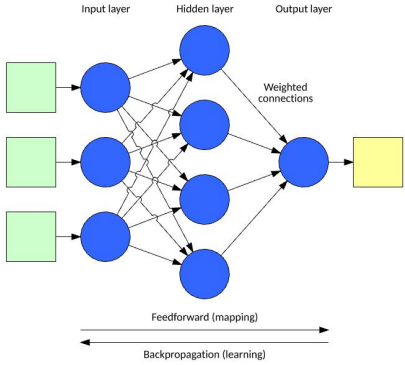

৮। ইভালুয়েশন *(Evaluation)*

এটা মডেল তৈরি চলাকালীন সময়েই শুরু হয়। মডেল কেমন পারফর্ম করছে, নতুন ডেটার বিপক্ষে কেমন করছে, ওভারফিটিং (মডেল তৈরির সময় মডেলকে কিছু ডেটা দিতে হয়, যা থেকে সে শিখবে (মডেল ফিটিং বলে এটাকে)। এটাকে বলে ট্রেনিং ডেটা। যদি মেশিন লার্নিং মডেল ট্রেনিং ডেটায় ভাল করে, কিন্তু টেস্ট ডেটায় ভালো না করে, তখন তাকে ওভারফিটিং বলে।) করছে কি না? – এসব দেখা হয়। আমরা মডেল তৈরির সময় এসব হাতে কলমে শিখব।

৯। ডিপ্লয়মেন্ট *(Deployment)*

মডেল তৈরির পর সেটাকে মার্কেটে ছাড়তে হবে। যেমন আমি একটা মডেল বানালাম, যেটা কিছু ডেটা নিয়ে ক্যান্সার কী গুরুতর না কি চিকিৎসাযোগ্য তা বের করতে পারে। এখন এটা ডাক্তারের কাছে না পৌঁছালে কি আমার কোনো লাভ হবে? না! আর এখন সেটাকে ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দেয়ার পার্টই হলো ডিপ্লয়মেন্ট।

একটা উদাহরণ দেই। আমরা ছেলের ছবিকে মেয়ে করার, নিজের বুড়ো-পিচ্চিকালের ছবি বের করার অ্যাপ প্রায় সবাই-ই ব্যবহার করেছি। এ অ্যাপটা হলো সেই মেশিন লার্নিং মডেলের ডিপ্লয়মেন্ট।

১০। ফিডব্যাক (*Feedback*)

আমি মডেল করে ডাক্তারকে দিলাম। এখন এটা ভালো কাজ করছে কি না, ভুল আছে কি না, কেমন পারফর্ম করছে, ভুল করে থাকলে সেগুলো জেনে মডেল টিউনিং করে আরো পারফেক্ট করা – এসব হচ্ছে ফিডব্যাক পার্টে।

এ সবগুলো পার্ট মিলে হলো – ডেটা সায়েন্স মেথডলজি। আশা করি, কীভাবে কি করা হয় সেগুলো আমরা বুঝতে পেরেছি। পরের পর্বে নানারকম মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম নিয়ে আলোচনা করব, সেগুলো কখন কেনো ব্যবহার করব সেগুলো নিয়ে জানব।

ভূমিকম্প ও ডাউকি ফল্ট

মাহফুজ আহম্মেদ মাসুদ

কথা শুরুর আগে

প্রধানত ভূ-পৃষ্ঠের হঠাৎ পরিবর্তন জনিত কারণে, আগ্নেয়গিরি সংঘটিত হওয়ার কারণে অথবা শিলাচ্যুতি জনিত কারণে যে-ধরনের ভূকম্পনের উৎপত্তি ঘটে তাকে ভূমিকম্প বলে। ভূমিকম্পের স্থায়িত্ব সাধারণত কয়েক সেকেন্ড হয়ে থাকে।

বেশিরভাগ ভূমিকম্পের আরো কারণ হল ভূগর্ভে ফাটল ও স্তরচ্যুতি হওয়া, ভূমিধস, খনিতে বিষ্ফোরণ বা ভূগর্ভস্থ নিউক্লিয়ার গবেষণায় ঘটানো, আণবিক পরীক্ষা থেকেও হতে পারে। ভূমিকম্পের প্রাথমিক ফাটলকে বলে ফোকাস বা হাইপোসেন্টার। আর হাইপোসেন্টার বরাবর মাটির উপরিস্থ জায়গাকে বলে এপিসেন্টার।

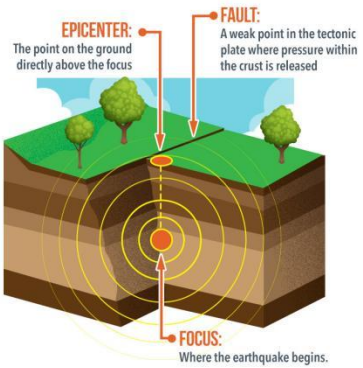

ভূমিকম্পের সময় যে সিসমিক ঢেউ তৈরি হয়, সেগুলো বিশ্বজুড়েই কম বা বেশি মাত্রায় প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর যে-কোনো স্থানে মাটির নিচের কম্পন সৃষ্টি হলে তা সিসমোগ্রাফে মাপা হয়। সিসমোগ্রাফ স্টেশনে রেকর্ড হওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল, সময়কাল ও স্থায়িত্বকাল নির্ধারণ করা হয়। ভূমিকম্পের মাত্রা মাপার যন্ত্রকে সিসমোমিটার (*seismometer*) বলে।

ভূমিকম্পের মাত্রা মাপার যন্ত্র সিসমোমিটার

রিখটার স্কেলে ভূ-কম্পনের মাত্রা মাপা হয়। ভূমিকম্পের মাত্রা নির্ধারণের জন্য বিশ্বজুড়ে বহুল ব্যবহৃত স্কেলের নাম রিখটার স্কেল। সিসমোগ্রাফ থেকে পাওয়া তথ্য এবং রেখাচিত্র বিশ্লেষণ করে গাণিতিকভাবে ভূমিকম্পকে মাপা হয় রিখটার স্কেলের মাধ্যমে। রিখটার স্কেলে 0 থেকে 10 মাত্রা পর্যন্ত মাপা যায় ভূমিকম্পের তীব্রতাকে।

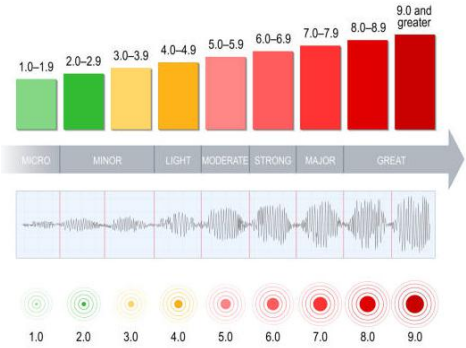

সিসমোমিটারে রেকর্ড হওয়া ভূকম্পনের বিস্তার, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে সিসমোমিটারের দূরত্ব বিবেচনা করে ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয়। সেই সঙ্গে যোগ করা হয় ভূমিকম্পের স্থায়িত্ব। এসব মিলিয়ে রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয়।

বিবিসির এক প্রতিবেদনে ভূমিকম্পের বিভিন্ন মাত্রা সম্পর্কে বলা হয়েছে, রিখটার স্কেলের 1 এবং 2 মাত্রার ভূমিকম্প প্রায় সময়ই হতে পারে এবং এটা খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটে কিন্তু মানুষ টের পায় না। যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোর মতো জায়গায় প্রায় প্রতিদিনই 1 থেকে 2 মাত্রার ভূকম্পন হওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে এসব ভূমিকম্পের মাত্রা এতটাই হালকা যে তা অনুভূত হয় না তবে সিসমোমিটারে তা ধরা পড়ে।

রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা যদি 7 কিংবা 8 হয় তবে সেটাকে প্রাণঘাতী ভূমিকম্প হিসেবে ধরা হয়। এই মাত্রার ভূমিকম্পগুলো তীব্রভাবে অনুভূত হয় এবং এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বেশি হয়।

বাংলাদেশের ভূমিকম্পের জোন এবং ভৌগলিক অবস্থান

গবেষণা মডেল বলছে ইন্ডিয়ান, ইউরেশিয়ান এবং বার্মা তিনটি গতিশীল প্লেটের সংযোগস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশের দুই দিকের ভূ-গঠনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের শক্তি জমা হয়েছে। ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলোকে সিসমিক রিস্ক জোন বলে। ১৯৮৯ সালে ফরাসি ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোর্টিয়াম বাংলাদেশের ভূমিকম্প বলয় সম্বলিত মানচিত্র তৈরি করে। এ মানচিত্রে বাংলাদেশকে তিনটি প্রধান বলয়ে ভাগ করা হয়। আর এ বলয়গুলোকে একসাথে বলা হয় 'সিসমিক রিস্ক জোন।

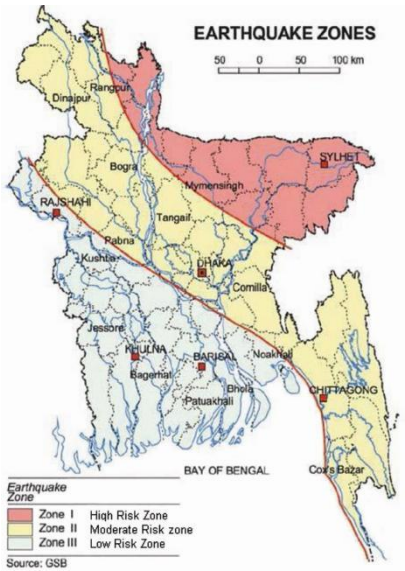

Seismic zoning map of Bangladesh (Ali, Choudhury 1994)

বুয়েটের গবেষকদের প্রস্তুতকৃত ভূ-কম্পন-এলাকাভিত্তিক মানচিত্রে দেখা যায়, বাংলাদেশের ৪৩% এলাকা ভূমিকম্পের উচ্চমাত্রার ঝুঁকিতে (জোন-১), ৪১% এলাকা মধ্যম (জোন-২) এবং ১৬% এলাকা নিম্ন ঝুঁকিতে (জোন-৩) রয়েছে। যেখানে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ভূ-কম্পন মানচিত্রে ২৬% উচ্চ, ৩৮% মধ্যম এবং ৩৬% নিম্ন ঝুঁকিতে ছিল। নতুন মানচিত্র অনুযায়ী, মাত্রাভেদে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার অবস্থান নিম্নরূপ:

জোন-১ : সিলেট, পঞ্চগড়, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সম্পূর্ণ অংশ, এবং ঠাকুরগাঁও, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজারের অংশবিশেষ।

জোন-২ : রাজশাহী, নাটোর, মাগুরা, মেহেরপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনী এবং ঢাকা।

জোন-৩ : বরিশাল, পটুয়াখালী, এবং সব দ্বীপ ও চর।

ডাউকি ফল্ট

উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, *"The Dauki fault is a major fault along the southern boundary of the Shillong Plateau that may be a source of destructive seismic hazards for the adjoining areas, including northeastern Bangladesh."*

জোন-১-এ অবস্থিত বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল ভূমিকম্পজনিত কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে। কারণ সিলেট-সুনামগঞ্জ ও ভারতের শিলংকে বিভক্ত করেছে ডাউকি নদী, আর এই ডাউকি নদী ডাউকি চ্যুতি *(Dauki fault)* বরাবর অবস্থান করছে, আর ভূতাত্ত্বিক চ্যুতিগুলোই বড়ো ধরনের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। সিলেটের সীমান্ত এলাকাবর্তী এধরনের চ্যুতিগুলোর কোনো কোনোটিতে সাব-ডাউন ফল্ট রয়েছে, যেগুলো ভূমিকম্প ঘটালে

বড়লেখার পাথারিয়া পাহাড় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। কারণ এতে করে পাথারিয়া অন্তর্চ্যুতি *(Patharia anticline)* নিচের দিকে মোচড় দিতে পারে।

ডাউকি ফল্ট জোন

সিলেটে ৭ই জুন দুই দফা ভূমিকম্প হয়েছে। ওইদিন সন্ধ্যা ৬টা ২৮ মিনিট ও ৬টা ৩০ মিনিটে সিলেট শহর ও এর আশেপাশের এলাকায় ভূমিকম্প হয়। সিলেট আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ সাঈদ চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, **'ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৮ ও এর উৎপত্তিস্থল সিলেট জোন।'**

তবে, একটা মাত্র কেন্দ্রে অনুভূত হওয়ায় ভূমিকম্পের মূল কেন্দ্র ও গভীরতা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এছাড়াও এর আগে, গত ২৯মে সিলেটে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চার দফা ভূকম্পন অনুভূত হয়। দফায় দফায় ভূমিকম্পে সাধারণ মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি বিশেষজ্ঞরাও বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা প্রকাশ করে সতর্ক থাকতে বলেছিলেন। বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সিলেট এলাকায় ওইদিন সকাল থেকে অন্তত পাঁচবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে এবং দফায় দফায় এমন কম্পনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়দের মধ্যে। আবহাওয়াবিদ ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন সাধারণত বড়ো কোনো ভূমিকম্পের আগে বা পরে এমন দফায় দফায় মৃদু কম্পন হতে পারে।

ঢাকা আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের সিনিয়র

আবহাওয়াবিদ মুমিনুল ইসলাম বলছেন, "বেলা তিনটা পর্যন্ত পাঁচবার কম্পন অনুভূত হয়েছে। এর মধ্যে চারটি হলো ৪.১, ৪, ৩ এবং ২.৮ মাত্রার। কোনো কোনটি এত মৃদু যে সব স্টেশনে মাত্রা মাপাও যায়নি"। সিলেটে এমন আর কখনো হয়নি যদিও সিলেট অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরেই ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে। বিশেষ করে তিনটি প্লেটের সংযোগস্থলে বাংলাদেশে। সিলেটের জৈন্তা ছিল ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। তবে সবগুলোই ছোটো ধরণের ভূমিকম্প।

"কিন্তু ভূমিকম্পের প্রি-শক ও আফটার-শক থাকে। অনেক সময় বড়ো ভূমিকম্পের আগে ছোটো কম্পন হয়। আবার বড়ো ভূমিকম্প হলে তারপর ছোটো ছোটো কম্পন হয়। যেহেতু সিলেট অঞ্চল ভূমিকম্প প্রবণ সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে। তাছাড়া ওই অঞ্চলে বড়ো ভূমিকম্পের ইতিহাস আছে।"

বাংলাদেশের ভবিষ্যতে ভূমিকম্পের ঝুঁকি

সিডিএমপির সাবেক ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ূম বলেছেন-একবার বুয়েটের সঙ্গে সরকারের সমন্বিত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি সিডিএমপির এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকার ৭২ হাজার ভবন ধসে পড়বে। আর সেখানে তৈরি হবে সাত কোটি টন কনক্রিটের স্তুপ। ভাবা যায়!

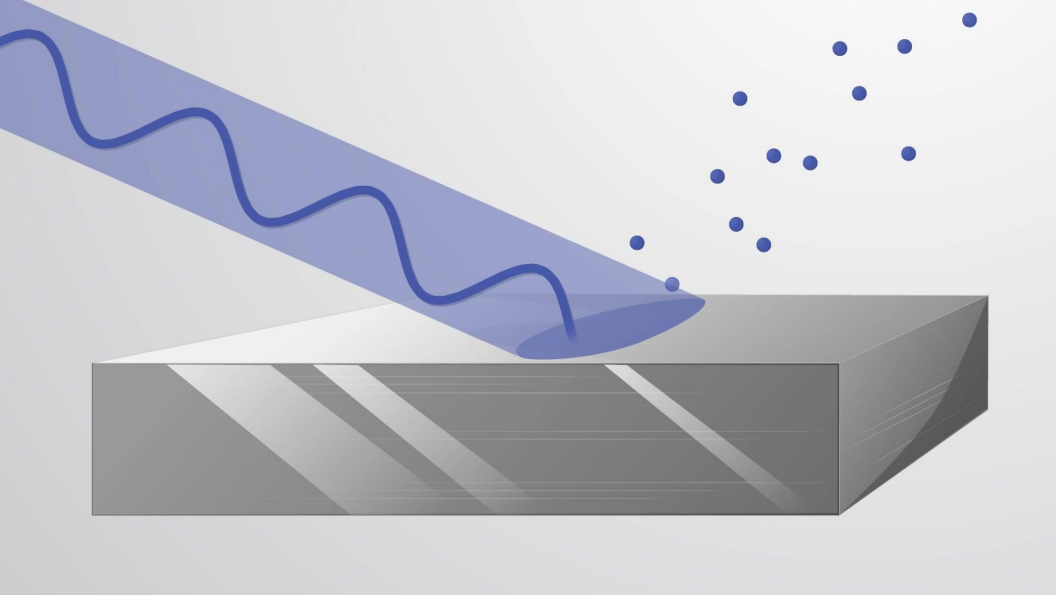

স্বতাপে উদ্ভাসিত মহাবিশ্ব

মো : সিফাত হাসান

বাকি লেখা পড়ার আগে আমাদের কিছু বিষয় জেনে নিতে হবে! এগুলো হলো -

কোনো বস্তুতে এলোমেলোভাবে চলন্ত বা কম্পিত কণাদের শক্তিই হচ্ছে তাপশক্তি। ত্বরণে থাকা চার্জগুলো ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েভ সৃষ্টি করে। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েভের একটা প্রকার হচ্ছে আলো। তাই এলোমেলোভাবে কম্পিত চার্জিত কণারা আলো বিকিরণ করে। বস্তুতে যত বেশি তাপ দেওয়া হয়, বস্তুর কণাগুলো তত বেশি কম্পিত হয়। তাই তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সেসব কণা থেকে নির্গত তাড়িতচৌম্বকীয় বিকিরণ বা আলোর কোয়ান্টার (ফোটন) গড় কম্পাঙ্কও বৃদ্ধি পায়; আর এই গড় কম্পাঙ্কই সেই আলোর বর্ণ ঠিক করে দেয়। যেমন :

✧ সূর্যের পৃষ্ঠতাপ প্রায় ৬০০০ কেলভিন হওয়ায় নির্গত

ফোটনের বেশিরভাগের কম্পাঙ্ক থাকে কমলা বর্ণের কাছাকাছি।

✧ 'ব্লু সুপার জায়ান্ট স্টার' রাইগেলের পৃষ্ঠতাপ প্রায় ১২,০০০ কেলভিন হওয়ায় নির্গত ফোটনের বেশিরভাগের কম্পাঙ্ক থাকে নীল বর্ণের কাছাকাছি যেটা উচ্চকম্পাঙ্কের জন্য, এমনি প্রচুর অতিবেগুনীর কম্পাঙ্কের আলোও বিকিরিত হয়।

✧ আমাদের দেহের তাপমাত্রা মাত্র ৩১০ কেলভিন হওয়ায় নির্গত আলোর কম্পাঙ্ক অনেক কম যার ফলে অবলোহিত (ইনফ্রারেড) আলো বিকিরণ করে, যা চোখে দেখা যায় না। তাই, দূর থেকে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ইনফ্রারেড সেন্সরযুক্ত থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে!

তাপ যত বেশি, কম্পাঙ্ক তত বেশি; কম্পাঙ্ক যত বেশি, আলোর উজ্জ্বলতাও (শক্তির তীব্রতা) তত বেশি; সমানুপাতিক সম্পর্ক। আলোর যে বর্ণ আমরা দেখি (অথবা দেখা সম্ভব না), তা সেই আলোর কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে।

এবার মূল লেখায় আসি!

১৬৬০-এর দশকে স্যার আইজেক নিউটন যখন প্রিজমের ভেতর দিয়ে সূর্যালোকের যাওয়ার ফলে তার গঠনমূলক কম্পাঙ্কবিশিষ্ট বিভিন্ন আলোয় ভাগ হতে দেখলেন, তখন কি কল্পনাও করেছিলেন যে ওইসব বর্ণের আলোর আপেক্ষিক উজ্জ্বলতা একদিন কোয়ান্টাম জগতের দ্বার উন্মোচন করবে!

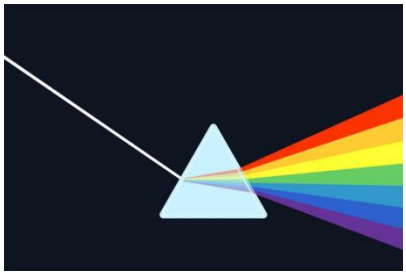

প্রিজমের সাহায্যে আলোকে নানা কম্পাঙ্কে ভাগ করেছিলেন নিউটন।

এরপর ১৮০০ সালের দিকে পর্যবেক্ষণ করা হয় – উত্তপ্ত কোনো বস্তু থেকে নির্গত আলোর বিভিন্ন কম্পাঙ্কের সাথে তাদের উজ্জ্বলতার (শক্তির তীব্রতা) সম্পর্ক রয়েছে এবং কীভাবে এই উজ্জ্বলতা কম্পাঙ্কের মানের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় সেটাও পরিমাণ করা হয়েছে। আর, এসব দেখে মনে হয়েছে – নির্গত আলোর উজ্জ্বলতা সরাসরি ঐ বস্তুর তাপীয় অবস্থার (তাপ ও তাপমাত্রা) সাথে সম্পর্কিত; আলোর উজ্জ্বলতা যেন তাপেরই উজ্জ্বলতা! এরপরই 'ব্ল্যাকবডি স্পেকট্রাম'-এর গল্প শুরু হয় যেটা এক নতুন সমস্যার জন্ম দেয়।

সময়টা ১৮৫৯ সাল, যখন স্যার গুস্তাভ রবার্ট কির্শফ প্রথম 'ব্ল্যাকবডি' টার্মটি ব্যবহার করেন। তিনি এমন এক কালোবস্তুকে কল্পনায় এনেছেন যেটা তার উপর পড়া সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ (আলো) শোষণ করতে পারে। তাপ দিতে থাকলে বস্তুর কণাগুলোর গতিশক্তি বাড়তে থাকে এবং আগের চেয়ে বেশি কম্পিত হতে থাকে; আর এই শক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বাইরে বেড়িয়ে যায় তাড়িতচৌম্বকীয় বিকিরণ আকারে যার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান থেকেই নির্গত শক্তির তীব্রতা (আলোর উজ্জ্বলতা) জানা যায়।

আর, 'ব্ল্যাকবডি স্পেকট্রাম' হচ্ছে – কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রার বস্তু থেকে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের আলো নির্গত হলে সেই আলোর উজ্জ্বলতা (ব্রাইটনেস) বনাম কম্পাঙ্কের (ফ্রিকুয়েন্সি) গ্রাফ, যা থেকে ওই নির্দিষ্ট তাপমাত্রার জন্য সকল কম্পাঙ্কের বিপরীতে আলোর উজ্জ্বলতা তথা শক্তির তীব্রতার পরিবর্তন (অ্যানার্জি ডিস্ট্রিবিউশন) বোঝা যায়।

তবে, মজার ব্যাপার হলো : 'ব্ল্যাকবডি'-এর আদর্শ উদাহরণ প্রকৃতিতে পাওয়াই যায় না; যদিও সূর্য বা তার মতো জ্যোতির্ময় মহাজাগতিক বস্তুগুলোকে মোটামোটি ভালো উদাহরণ হিসেবেই গ্রহণ করা হয়।

আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা তথা ক্লাসিকাল মেকানিক্স অনুযায়ী কম্পাঙ্ক বাড়ার সাথে উজ্জ্বলতাও বাড়বে এটাই স্বাভাবিক। তবে, পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য থেকে পাওয়া গ্রাফ অনুযায়ী – নিম্ন কম্পাঙ্কের জন্য এটা সত্য হলেও অতিবেগুনী এবং এর চেয়ে উচ্চকম্পাঙ্কের অঞ্চলের আলোর জন্য উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।

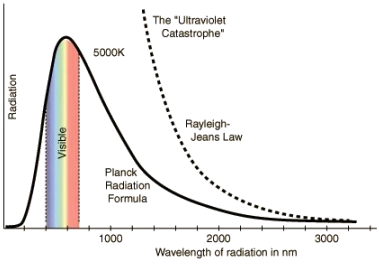

আজব না ব্যাপারটা? এটাকেই আবার ঘটা করে নাম দেওয়া হয়েছে 'আল্ট্রাভায়োলেট ক্যাটাস্ট্রোফি' (অতিবেগুনি বিপর্যয়)। বিপর্যয়ই বটে; তাঁরা ভেবেছিলেন কতো সহজে ঝুলে থাকা ঝামেলাটা মিটে যাবে, অথচ আশায় গুড়েবালি!

যাই হোক! এখানে একটা জিনিস আগেই মাথায় রাখা উচিৎ ছিল : উচ্চকম্পাঙ্কের জন্য ক্লাসিকাল মেকানিক্স অনুযায়ী শক্তির তীব্রতা অকল্পনীয় আকারের বেশি হয়ে যেত; মনে হত যেন সূর্যে বসে পিকনিক করছি বা তার চেয়েও ভয়ানক কিছু! সহজ ভাষায় – অতিউচ্চ কম্পাঙ্কের আলোর জন্য শক্তির তীব্রতা অসীমের দিকে চলে যেত; অথচ এটা বাস্তবতা বিরুদ্ধ। তাই এই বিপর্যয় থেকে কীভাবে বেড়িয়ে আসা যায় সেটা নিয়েই স্যার ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ভাবতে লাগলেন এবং ১৯০১ সালের দিকে একটি হাইপোথিসিস দাঁড় করান, যেটা এই সমস্যাটি নিয়ে ডিল করতে পারে।

তবে, সেটা জানার আগে একটি থট এক্সপেরিমেন্ট করা যাক!

ধরুন, আপনি আপনার দুই হাতকে পরস্পর থেকে এক মিটার দূরত্বে রেখেছেন। এক হাতের তালুকে ফিক্স রাখতে হবে; উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য হাতের তালু সেই হাতের সাথে

স্পর্শ করাবেন। শর্ত হচ্ছে : যে হাতটি এগিয়ে ফিক্সড হাতের কাছে আনতে থাকবেন সেটা একবারে আনা যাবে না। বরং প্রতি সেকেন্ডে মধ্যবর্তী দূরত্বের অর্ধেক পরিমাণ এগুতে পারবেন। মানে 50 cm এগোতেও 1s লাগবে, এরপর 25 cm এগোতেও 1s-ই লাগবে; এরকম! তাহলে কতগুলো স্টেপ লাগবে?

50 cm, 25 cm, 12.5 cm, ... , 0.4 cm, 0.2 cm, 0.1 cm, 0.05 cm, ... ∞

সিরিয়াসলি! অসীম সংখ্যক লাগবে। প্রতি স্টেপে ১ সেকেন্ড করে লাগলে দুই হাত কবে মিলবে নিজেই হিসাব করে নিন। (অসীম সেকেন্ড!)

কী বুঝলেন? সমস্যা না? এটাও একটা বিপর্যয়! এই দূরত্বকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাজীবন ভাগ করা যায় মনে করাতেই যত বিপত্তি! এমন হলে কবে ক্ষুদ্রতম ব্যাসের মৌলিক কণিকার চেয়েও হাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কম হত। অথচ বলতে হত হাতদ্বয় স্পর্শ করেনি এখনো! আজব!

সমাধান হচ্ছে - মধ্যবর্তী দূরত্ব একটা অতিক্ষুদ্রতম লিমিটকে ক্রম করা মানেই হাতদ্বয় স্পর্শ করেছে।

এই একইভাবে যখন স্যার ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক দেখলেন যে ক্লাসিকাল মেকানিক্সের ধারণায় চলতে গিয়ে যখন শক্তিকে নিরবচ্ছিন্ন মনে করে এগুচ্ছি, তখন একপর্যায়ে গিয়ে আর বাস্তবতার সাথে মিলছে না; তাহলে এটারও একটা ক্ষুদ্রতম লিমিট থাকাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। (দৈর্ঘ্যেরও লিমিট আছে যার চেয়ে ছোটো দৈর্ঘ্য অকল্পনীয় যাকে নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানও কাজ করতে অক্ষম, সেটা প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য; একইভাবে প্ল্যাঙ্ক সময়ও আছে!) পরে এটাকেই কাজে লাগিয়ে দেখলেন যে, এই ধারণা একই সাথে ক্লাসিকাল মেকানিক্সকেও সাপোর্ট দেয় আবার বাস্তবতার সাথেও মিলে যায়; কারণ, এর মাধ্যমে উচ্চকম্পাঙ্কের কোনো আলো কতটা শক্তি ধরে রাখতে

পারবে সেটা নির্দিষ্ট করা যাচ্ছে এবং সেটা অসীমে চলে যাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা থাকছে না। তিনি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের জন্য সেই আলোর এই ক্ষুদ্রতম শক্তিটিকে শক্তির ক্ষুদ্রতম একটি প্যাকেট বা কোয়ান্টাম হিসেবে বিবেচনা করলেন। (১৯০৫ সালে স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আলোর কণাধর্ম বিবেচনায় এক কোয়ান্টাম এনার্জি বহনকারী আলোক কণাকে 'ফোটন' বলেছেন) এবং যেহেতু একে আর ভাঙা সম্ভব নয়, তাই সব শক্তিই পূর্ণসংখ্যক কোয়ান্টামের সমন্বয়ে গঠিত বলে ধরে নেওয়াই যায়; 'কোয়ান্টাম' এর বহুবচন 'কোয়ান্টা'।

তবে, সব কম্পাঙ্কের জন্য ক্ষুদ্রতম শক্তির (কোয়ান্টাম এনার্জি) মান একই হয় না। কম্পাঙ্ক যার বেশি, এক কোয়ান্টাম এনার্জিও তার বেশিই হবে। আমরা অলরেডি জানি যে, তরঙ্গের কম্পাঙ্ক ν, *Greek: nu* যত বেশি তার শক্তিও E তত বেশি; অর্থাৎ, $E \propto \nu$। এই শক্তি যদি সেই ক্ষুদ্রতম শক্তি (কোয়ান্টাম এনার্জি) হয়, তাহলেও এই সম্পর্ক সত্য। আর, এই সমানুপাতিক সম্পর্ককে সমীকরণে রূপ দিতে যে ধ্রুবকটি লেগেছে সেটাই প্ল্যাংকের ধ্রুবক *h;* $E=h\nu$। আর, n সংখ্যক কোয়ান্টামের মোট শক্তি, $E_n=nE=nh\nu$। (*h* কীভাবে পরিমাপ করা যায় সেটা ভিন্ন গল্প!) এভাবেই 'ব্ল্যাকবডি রেডিয়েশন'-এর সেই বিপর্যয় ঠেকাতে গিয়ে 'কোয়ান্টাইজড এনার্জি' ধারণা জন্ম নিলো!

তো, আবার গল্পে ফেরা যাক! বিশ শতকের শুরুর দিকে সেই ব্ল্যাকবডি স্পেকটার্মের গাণিতিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন লর্ড রেইলি এবং স্যার জেমস জিন্স। তবে, তারা ক্লাসিকাল মেকানিক্সের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে নিজেদের গাণিতিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর পর দেখলেন সেটা পর্যবেক্ষণের সাথে মিলেনি। (এই বিপর্যয় ও তার সমাধানের গল্প আগেই বলেছি!)

কিন্তু, স্যার ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক তার কোয়ান্টাইজড এনার্জির ধারনা দিয়ে যখন ব্ল্যাকবডি স্পেকটার্মের কম্পাঙ্কের ভিত্তিতে এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশন ব্যাখ্যা করলেন, তখন সেটা আশ্চর্যজনকভাবে পর্যবেক্ষণের সাথে মিলে গেলো! তাঁর সেই এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশন ফর্মুলাটি এরকম –

$$B(\nu, t) = \frac{2h\nu^3}{c^2}\frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

যেখানে, B⟶ উজ্জ্বলতা; ν⟶ কম্পাঙ্ক; T⟶ তাপমাত্রা; c⟶ আলোর বেগ = 299792458 $m/s \approx 3\times10^8$ ms^{-1}; h⟶ প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক =6.626×10^{-34} Js; k⟶ বোল্ডজম্যান ধ্রুবক =1.381×10^{-23} JK^{-1}. (এটাই এখন প্ল্যাঙ্ক'স ল!)

এখন যেহেতু আমরা প্ল্যাঙ্ক'স ল জানি। তাই, যেকোনো উত্তপ্ত বস্তুর (যেমন: সূর্য) সবচেয়ে উজ্জ্বল তাপীয় অংশের উজ্জ্বলতা (এবং তাপমাত্রাও জানাই যাবে) পর্যবেক্ষণ করে উপরের ফর্মুলা থেকে প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক (h) সহজেই বের করা যাবে!

গল্পের পরবর্তী অংশে নতুন চরিত্রের আগমন হয়, নতুন এক কিংবদন্তী, স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইন! তিনি স্যার ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের এই কোয়ান্টাজড এনার্জির কন্সেপ্টটা হজমই করতে পারছিলেন না; তাই, এর পেছনের ফিজিক্সটাও বুঝতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে! তিনি ১৯০৫ সালের দিকে অবশেষে এটা বুঝতে পারলেন যে, "আসলে আলোও কোয়ান্টাইজড, আর তাই আলো যে শক্তি বহন সেটাও কোয়ান্টাইজড"।

আর যেহেতু কম্পিত কণারা আলো হিসেবে শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করে, তাই এই শক্তির বিনিময়ও প্যাকেট আকারে হয় তথা একটি করে ফোটন শোষণ করে; শক্তির নিরবচ্ছিন্ন শোষণ বা বিকিরণ হয় না। এভাবেই প্ল্যাঙ্কের সেই আবিষ্কার আইনস্টানকে ফোটনের অস্তিত্বের ব্যাপারে হাইপোথিসিস দাঁড় করানোর পথ দেখিয়ে দিয়েছে, যেটা কণা ও তরঙ্গ উভয়ের মতো আচরণ করতে পারে, যা এক কোয়ান্টাম এনার্জি বহন করে।

$$E = hf$$

এটাই সেই এক কোয়ান্টাম শক্তি যা ঐ ফোটনের কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক। আর, আইনস্টাইন এই সম্পর্কটি আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া (ফটোইলেক্ট্রিক ইফেক্ট) দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন যার জন্য তিনি ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার পান; যদিও পুরস্কার পরের বছর গ্রহণ করেছিলেন।

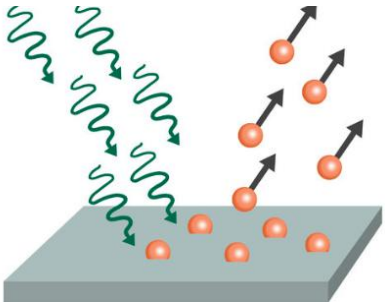

এটার মূল কাহিনী ছিলো এরকম – "ঠিকভাবে (যথাযথ এক্সপেরিমেন্টাল সেটাপে) যদি কোনো ধাতবপাতের (মেটালিক সার্ফেস) উপর যথাযথ কম্পাঙ্কের আলো (ফোটন) ফেলা হয়, তাহলে সেই ফোটন ঐ পাত থেকে ইলেকট্রনকে বাইরে ছিটকে ফেলতে পারে।"

অনেকেই ভাবতে পারেন – এ আর এমন কী! এর জন্য এতো চিন্তারই বা কী আছে, নোবেলই বা পেলেন কেনো?

হ্যাঁ! এই ব্যাপারটুকু বোঝা সহজ যে – "আলো শক্তি বহন করে এবং পাতের বাইরের অংশের ইলেকট্রন দুর্বলভাবে অবস্থান করে; তাই, আলোর সেই শক্তি ইলেক্ট্রনে সঞ্চারিত হওয়ায় তার গতিশক্তি বাড়ার কারণে বেড়িয়ে আসা খুবই স্বাভাবিক।" এতটুকুতে চিন্তার কিছু না থাকলেও এই ঘটনার বিস্তারিত এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা আইনস্টাইনকে চিন্তায় ফেলেছিল। উনার সহ আমাদের সবার সাধারণ ধারণা ছিল – ছিটকে পড়া ইলেক্ট্রনের গতিশক্তি তার উপর আপতিত আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করবে; সমুদ্রের তরঙ্গের (ঢেউ) তীব্রতা তার উচ্চতা (তরঙ্গের বিস্তার) দেখলেই বোঝা যায়, একইভাবে আলো তথা

তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের শক্তিও তার বিস্তারের সাথে প্রধানত সম্পর্কিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, পরীক্ষালব্ধ উপাত্ত থেকে দেখা যায় ব্যাপারটা মোটেই এমন না, বরং পাতের সেই ইলেকট্রনের গতিশক্তি নির্ধারণ করে আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক, তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের বিস্তার নয়। মূল কথা – আলোর বিস্তারের পরিবর্তে তার কম্পাঙ্কই ঠিক করে দেবে সেই আলোর শক্তি কতো আর সেই শক্তি ইলেকট্রনের ছিটকে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম গতিশক্তির সমান হওয়াই যথেষ্ট। তবে, আলোর তরঙ্গের বিস্তার অন্যকিছু নির্ধারণ করে, তা হলো – ঐ পাত থেকে কতগুলো ইলেক্ট্রন নির্গত হতে পারে সেটা। "শক্তির সম্পর্ক আলোর কম্পাঙ্কের সাথে" – এটা ছিল আসল চিন্তার বিষয়!

তার মানে – ইলেকট্রনের গতিশক্তি ফোটনের কম্পাঙ্কের উপর তথা বর্ণের উপর নির্ভর করে। (আলোর বর্ণ আর তার কম্পাঙ্কের সম্পর্ক শুরুর দিকে বলেছি!)

এখন প্রশ্ন আসতে পারে – "কতগুলো ইলেক্ট্রন ছিটকে যাবে সেটা আলোর তীব্রতার উপর কীভাবে নির্ভর করে?" ওয়েল! ফোটন যতো বেশি, আলোর তীব্রতাও (ইন্টেন্সিটি) ততো বেশি। আর, যতো বেশি ফোটন পাতে আঘাত করবে, ততো বেশি ইলেক্ট্রন বেড়িয়ে আসবে; তাই, ইন্টেন্সিটি যতো বেশি, ছিটকে আসা ইলেক্ট্রনও ততো বেশি।

আইনস্টাইন আলোর সাথে সম্পর্কিত 'ফোটন'-এর ধারণাটা এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, সেটা নিউটনের ব্যাখ্যা করা আলোর কণাধর্মের সাথেও মেলে যদিও পুরোপুরিভাবে কণা ধরা হয়নি, আবার স্যার ম্যাক্সওয়েলের বর্ণিত তরঙ্গধর্মের সাথেও যায় যদিও (ফোটনকে) শুধু তরঙ্গও ধরা হয়নি। এটা এমন এক ধারণা যা যথাসময়ে যথাস্থানে যথাযথ পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে কণা বা তরঙ্গ উভয়ের মতোই আচরণ করতে পারে; আর, এটাই আলোর কণা ধর্মের প্রমাণ ও তরঙ্গ ধর্মের প্রমাণের যথাযথ ক্যান্ডিডেট। এটাই

ফোটন, যেটা কোয়ান্টাম ওয়ার্ডের দ্বার উন্মোচন করে পূর্বধারণার সরল-সহজ জগতকে জটিল করে তবু নতুন করে জানার আগ্রহ জাগিয়েছে, যা 'কোয়ান্টাম মেকানিক্স' নামে নতুন এক শাখার জন্ম দিতে বাধ্য করেছে যেটা এই জগততে বোঝার পথে নিত্যহাতিয়ার হয়ে থাকবে যা দেখতে অদ্ভূত সুন্দর জটিল, দুর্বোধ্য তবু বোধ্য!

তথ্যসূত্র

[1] *https://www.britannica.com/science/Plancks-radiation-law*
[2] *https://www.privatdozent.co/p/einsteins-1905-paper-on-the-photoelectric-8e3*
[3] *https://physicsworld.com/a/einsteins-revolutionary-paper*
[4] *https://www.youtube.com/watch?v=97AqZBjcdUM* (The Action Lab : The Ultraviolet Catastrophe Experiment)
[5] *https://www.youtube.com/watch?v=tQSbms5MDvY* (PBS Space Time : Planck's Constant & The Origin of Quantum Mechanics)
[6] *https://www.youtube.com/watch?v=oYnp0WZDhYQ* (The Action Lab : Knocking Electrons With Light – The Photoelectric Effect)
[7] *https://www.youtube.com/watch?v=kS4ECdzONfE* (World Science Festival : Photoelectric Effect – Einstein's Nobel Prize

প্যারালাল ইউনিভার্স ও অন্যান্য

রুশলান রহমান দীপ্ত

সায়েন্স ফিকশন, পপ লেভেলের ফিজিক্স অথবা অ্যাকাডেমিক ফিজিক্সের প্রতি যাদের নূন্যতম জানা শোনাও আছে তাদের প্রায় সবাই প্যারালাল ইউনিভার্সের কথা শুনেছেন। আমরা যদিও জানি এর সরাসরি কোনো প্রমাণ বিজ্ঞানীরা এখনও পাননি তাও এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের আগ্রহ প্রচুর।

নিচের তিনটি শব্দ খেয়াল করুন,

১। প্যারালাল ইউনিভার্স

২। মাল্টিভার্স

৩। হায়ার ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ড

তিনটি শব্দ কী একই রকম লাগে? কী মনে হয় ৩টি শব্দ একই সত্ত্বাকে বুঝাতে চাচ্ছে? যদি আপনি ভাবেন "হ্যা" তাহলে আপনি ভুল করছেন। এরা এক জিনিস নয়। পার্থক্য আছে। একটি একটি করে আলোচনা করি।

মাল্টিভার্স

মাল্টিভার্স দ্বারা মূলত বহু মহাবিশ্বকে বোঝানো হয়। যদি আমাদের মহাবিশ্বকে একটি সসীম গোলক হিসেবে কল্পনা করেন তবে ভাবতে

পারেন আর একটি বিশাল জগতে আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ গোলক ভাসছে। এই সকল লক্ষ লক্ষ গোলককে এক সাথে মাল্টিভার্স বলা হয়। আর যে বিশাল আরেকটি জগতে গোলকগুলো ধারণ করছে তাকে বলে সুপারভার্স *(Superverse)*। একটি গোলকের অভ্যন্তরীণ ফিজিক্সের নীতি অন্য গোলকের থেকে সাধারণত আলাদা হয়ে থাকে।

প্যারালাল ইউনিভার্স

ভাবুন সুপারভার্সে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মহাবিশ্ব ভাসছে। এদের মধ্যে শত শত মহাবিশ্ব এমন ও থাকতে পারে যাদের অভ্যন্তরীণ ফিজিক্সের নীতিগুলো আমাদের মহাবিশ্বর সাথে পুরোপুরি এক। এমনকি মৌলিক ধ্রুবকগুলোও যেমন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, প্লাংকের ধ্রুবক ইত্যাদি। এই যে মহাবিশ্বগুলো, যাদের প্রকৃতির নীতি আমাদের মহাবিশ্বর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাদেরকে বলা হয় আমাদের মহাবিশ্বের সমান্তরাল মহাবিশ্ব। অনেকেই ভাবেন মাল্টিভার্স আর প্যারালাল ইউনিভার্স বুঝি একই।

মনে রাখবেন সকল প্যারালাল ইউনিভার্সই মাল্টিভার্স-এর অংশ কিন্তু সকল মাল্টিভার্স-এর অংশ হিসেবে থাকা মহাবিশ্বগুলো আমাদের প্যারালাল ইউনিভার্স নয়।

হাইয়ার ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ড

আমাদের জগতটা স্থানে ত্রিমাত্রিক। কিন্তু ভাবুন তো যদি এমন হয় আরো উচ্চ মাত্রার জগৎ আছে। আর তা আছে আপনার বাড়িতেই। হ্যা! কিছু আধুনিক থিওরি আমাদের তাই বলে। উচ্চমাত্রার জগতগুলো আমাদের মহাবিশ্বের বাহিরেই থাকবে এমন কোনো কথা নেই। এরা আমাদের চিরচেনা জগতেই থাকতে পরে। কিন্তু তা অতি আণুবীক্ষণিক। প্যারালাল ইউনিভার্স বলতে আমরা স্বতন্ত্র মহাবিশ্বকে বুঝি। কিন্তু হাইয়ার ডাইমেনশনাল মহাবিশ্ব পুরোপুরি অমন নয়। তবে হ্যা, কিছু কিছু থিওরিতে যেমন *M theory*-তে

উচ্চমাত্রার জগৎ আমাদের মহাবিশ্বের বাহিরেও অবস্থান করতে পারে। কিন্তু তা আমাদের সমান্তরালে নয়। অর্থাৎ ওই সকল জগৎ আমাদের মতো নয় কোনো দিক দিয়েই।

প্যারালাল ইউনিভার্সের উৎপত্তি

প্যারালাল ইউনিভার্সের অবতারণা অনেক থিওরিতেই করা হয়েছে। তার মধ্যে কিছু জনপ্রিয় থিওরি হলো,

কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকে প্যারালাল ইউনিভার্স

সহজ উদাহরণ যদি দিতে চাই তাহলে বলা যায় এমন আপনি এক টাকার কয়েন টস করলেন। শাপলা পড়ল। কেন? মানুষ পড়ার সম্ভাবনাও তো ছিল ৫০% না কি? পড়লো না কেন? আমাদের চিরচেনা জগতে এর ব্যাখা দেওয়া সম্ভব। টস করার সময় কয়েনটি কোন এঙ্গেলে টস করেছিলেন, বায়ুর ঘর্ষণ, কয়েনের অরিয়েন্টেশন ইত্যাদি অনেকগুলো অজানা চলক ছিল। যদি আপনি সেগুলো জানতে পারেন তাহলে বলে দিতে পারবেন শাপলা পড়বে না মানুষ। কিন্তু যদি আপনি অণু-পরমাণুর জগতে এমন কোনো সম্ভাবনার পরীক্ষা চালাতেন? আর ধরেই নিন আপনি আবার শাপলা পেলেন। কিন্তু কেনো পেলেন তার উত্তর দেওয়ায় পদার্থবিদরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে একদল আছেন যারা ব্যাখ্যা করেন এই ভাবে যে আপনার মহাবিশ্বে শাপলা পড়লেও অন্য মহাবিশ্বে মানুষ পড়েছে। এই সিদ্ধান্ত কিন্তু মন গড়া নয়। এর ম্যাথম্যাটিকাল বেসিস রয়েছে।

ইনফ্লেশন থিওরি থেকে প্যারালাল ইউনিভার্স

মহাবিশ্ব সৃষ্টি কীভাবে হয়েছিল তার ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে ইনফ্লেশন থিওরির জুড়ি নেই। জনপ্রিয় একটি তত্ত্ব এটি। এই থিওরির অনেকগুলো শাখাও রয়েছে। তার মধ্যে "কেওটিক ইনফ্লেশন *(chaotic*

inflation)" একটি। এই তত্ত্ব মতে আমাদের মহাবিশ্বের মতো প্রতিনিয়ত অগনিত মহাবিশ্ব বিগ-ব্যাং-এর মতো ঘটনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

স্ট্রিং থিওরি থেকে প্যারালাল ইউনিভার্স

Theories of everything-এর মধ্যে এটি নামকরা *Candidate*। প্রায় সকলেই এর নাম জানি। হাইয়ার ডাইমেনশন, স্ট্রিং, ব্ল্যাকহোল, বিগ-ব্যাং-এর মতো রোমাঞ্চকর বিষয়গুলো নিয়ে এর ব্যাপ্তি। এই থিওরি মতে আমাদের মহাবিশ্ব ১০^{৫০০} টি মহাবিশ্বর একটি। স্টিং থিওরির টি ভার্সন রয়েছে। এসবগুলো মিলে *M theory*-র সৃষ্টি। *M*-এর পূর্নরূপ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে দ্বন্ধ আছে। যা-হোক একে *Membrane theory*-ই বলা হয় সাধারণত।

প্যারালাল ইউনিভার্সের যৌক্তিকতা কতটুকু?

আসলে জানেন কি মহাবিশ্ব অতিমাত্রায় সুক্ষ্মভাবে সজ্জিত। মানে বুঝেন নি? বলছি। ধরুন,
ইলেকট্রনের ভর যদি একটু হের-ফের করেন অথবা সবল নিউক্লিয় বল যদি ২% বেশি শক্তিশালী অথবা দুর্বল হত অথবা মহাকর্ষ বল যদি ০.১% বেশি শক্তিশালী/দুর্বল হত অথবা ডার্ক এনার্জির মান যদি ০.০০১২% (১১৮টি শুন্য) পরিমানও যদি কম বা বেশি হত অথবা ফাইন স্ট্রাকচার কনস্টেন্টের মান ০.০০৭১ এর জায়গায় ০.০০৮ হতো আমাদের মহাবিশ্ব এখন কার মতো দেখতে হত না। এ যেন উপর থেকে একটি কলম ছেড়ে দিয়ে শিস-এর উপর কলমটাকে দাড় করানোর মতো অবস্থা। ফ্রেড হয়েল,

যিনি মহাবিশ্বের *Steady state model*-এর জনক, তিনি যখন নক্ষত্রের বুকে কার্বন তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করেন তখন তিনি হতবাক হয়ে যান। ৭.৬ সংখ্যার জায়গায় ৭.৩ অথবা ৭.৯ হলেই কার্বন উৎপাদন সম্ভব হবে না। ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম বইয়ে স্টিফেন হকিং বলেছেন, করেছেন, "পদার্থবিজ্ঞানের ধ্রুবকগুলো দেখে মনে হয় তা যেন প্রাণের উপযোগী করেই নির্ধারণ করা"।

মোদ্দাকথা এমন মহাবিশ্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম। মানে খুবই। শুধু কম বললে ভুল হবে। তাহলে মহাবিশ্ব কী ভাবে অস্তিত্বে আসলো? ৫-৬ টা ব্যাখ্যা বিজ্ঞানী মহলে বেশি সমাদৃত। এর মধ্যে মাল্টিভার্স হাইপোথিসিস ব্যাখ্যা দেওয়াটা বেশি কমন। এর মতে, অগনিত মহাবিশ্বর মধ্যে এমন সজ্জিত মহাবিশ্ব পাওয়া অবাক করার মতো কিছু নয়। এমন মহাবিশ্বও আছে যেখানে নক্ষত্র সৃষ্টি হয়নি, প্রাণের উদ্ভব হয় নি। আমরা শুধু অগনিত মহাবিশ্বর মধ্যে একটিতে আছি। আমাদের সঙ্গী হিসেবে আছে আমাদের প্যারালাল ইউনিভার্সের সাথীরা। তারাও হয়ত অবাক হয়। তাদের মহাবিশ্বকে অবলোকন করে।

যদি জিজ্ঞাস করেন এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায়?

আছে এমন পদার্থেবিজ্ঞানী যারা মানেন মাল্টিভার্স হাইপোথিসিস সত্য। এর ইনস্টুমেন্টাল বা এক্সপেরিমেন্টাল কোন প্রমাণ নেই। গানিতিক প্রমাণ আছে অবশ্য। এটি নিতান্তই আপনার ব্যাপার যে আপনি বিশ্বাস করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন।

সাবধান!!!

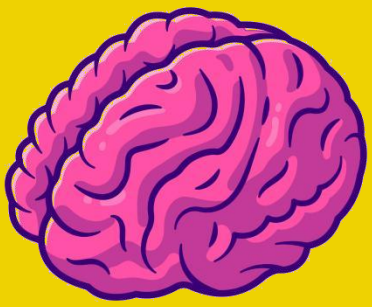

সামনে হিজিবিজি বর্ণে কীসব বিষয়ে জানি একটা লেখা আছে। লেখা পড়তে গিয়ে কারো করোটি থেকে মস্তিষ্ক খুলে বেরিয়ে আসলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন না!

~ বাণীতে *hoo man*

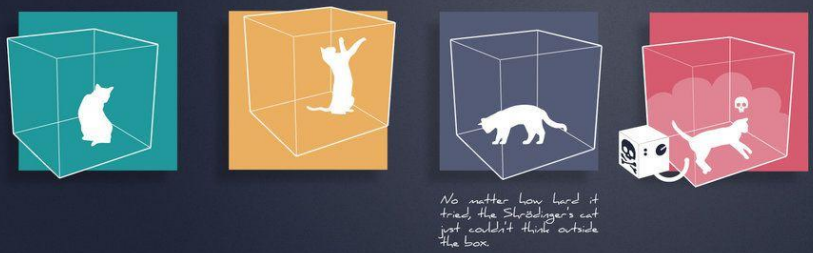

শ্রোডিঙ্গারের সমীকরণ

শাকির আহমেদ

পদার্থবিজ্ঞান পড়ার সময় আমরা মেকানিক্স হিসেবে দুইটা জিনিসের নাম বেশ শুনে থাকি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স বা নিউটনিয়ান মেকানিক্স ও কোয়ান্টাম মেকানিক্স। মূলত খালি চোখে যেসকল বস্তু দেখা যায় সেসব বস্তুর জন্য যে বলবিদ্যা খাটানো হয় তাকে বলে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স। একটি মার্বেল থেকে একটি গ্রহের গতির জন্যও এই ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স কার্যকর। নিউটনের সূত্রগুলোই এই মেকানিক্সের ভিত্তি গঠন করেছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে খালি চোখে যেসব বস্তু দেখা যায় না (যেমন ইলেকট্রন, কোয়ার্ক ইত্যাদি) সেসব বস্তুর জন্য কি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স খাটে না? উত্তর হচ্ছে হ্যা। খাটে। তবে খুব ভালোভাবে না। এসব ছোট্ট বস্তুর (পড়ুন কণা) জন্য রয়েছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স নামে আরেকটি শাখা। কেউ যদি বলে ম্যাক্রোস্কপিক লেভেলে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স খাটে আর মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স খাটে তাহলে কথাটি ভুল হবে। সঠিক কথাটি হবে,

ম্যাক্রোস্কপিক লেভেলে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ভালো খাটে আর মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ভালো খাটে। এর বিপরীত হলে ভালো খাটে না। এবার আসি দুই মেকানিক্সে আমরা কী নিয়ে ডিল করি তা নিয়ে। ম্যাক্রোস্কপিক লেভেলে আমরা বস্তুর ভরবেগ আর অবস্থান ভালোভাবে নির্ধারণ করতে পারি। বস্তুর আদিবেগ, শেষবেগ দেওয়া থাকলে কিছুক্ষণ পর বস্তুটির অবস্থান কোথায় হবে তাও বলে দেওয়া সম্ভব। তাই ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ডিল করে ডিটারমিনিস্টিক ফিজিক্স নিয়ে। অন্যদিকে কোয়ান্টাম জগতে একটু ঝামেলা আছে। আমরা কখনোই বস্তুর ভরবেগ ও অবস্থান একই সাথে শতভাগ নির্ভুলভাবে পরিমাপ করতে পারব না। একে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি বলে। ওই কোয়ান্টাম জগতে কণা আসলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কণার মতো না। এদের আচরণ তরঙ্গ তথা ওয়েভের মত। কণা চলে সেখানে সম্ভাবনার তরঙ্গে। সেটা ডিটারমিনিস্টিক না। একটি কয়েন টস করলে হেডও আসতে পারে আবার টেলও আসতে পারে। সম্ভাবনা $1/2$। কোয়ান্টাম জগতেও সকলকিছুই সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে আছে। এখন ডি ব্রগলি নামের একজন বিজ্ঞানী দেখান কোয়ান্টাম কণাগুলো একই সাথে কণা ধর্ম আবার একই সাথে তরঙ্গ ধর্ম প্রদর্শনে সক্ষম। তিনি দেখিয়েছিলেন $\lambda = h/p$ এখান থেকেই কণা-তরঙ্গ এই দুই ধর্ম একসাথে লালন করার ব্যাপারে আমরা জানতে পারি। এই সূত্রই আমাদের বলে, যেই কণার ভরবেগ আছে তার সাথে একটি তরঙ্গ ধর্মও আছে। একে বলে ম্যাটার ওয়েভ। শব্দ তরঙ্গে যেমন মাধ্যমের চাপের পরিবর্তন ঘটে, জল তরঙ্গে যেমন পানির তলের উচ্চতার পরিবর্তন ঘটে তেমনি ম্যাটার ওয়েভে যে মানের পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় ওয়েভ ফাংশন। একে গ্রিক অক্ষর Ψ (সাই) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর সরাসরি কোনো ভৌত তাৎপর্য নেই। এটি যেকোনো ফাংশন হতে পারে ও জটিলমান যুক্ত। এটি মূলত অবস্থান ও সময়ের ফাংশন।

তাই একে $\Psi(x,t)$ দ্বারাও প্রকাশ করা হয়। এই Ψ-এর উপর নানা অপারেশন দ্বারা ম্যাটার ওয়েভের নানা বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে আনা যায়। কোয়ান্টাম জগতে কণার অবস্থান সম্ভাবনা নির্ভর। কোনো একটি জায়গায় কোনো একটি Ψ যুক্ত কণাকে পাওয়ার সম্ভাবনাকে $|\Psi|^2$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $|\Psi|^2$ কে প্রবাবিলিটি ডেনসিটি বা সম্ভাবনা ঘনত্ব বলা হয়ে থাকে। তাহলে a থেকে b রেঞ্জের মধ্যে কোনো কণাকে পাওয়ার সম্ভাবনা হবে

$$P_{ab} = \int_a^b |\Psi(x,\mathrm{t})|^2 \mathrm{d}x \qquad (1)$$

তাহলে কীভাবে আমরা কোনো কণার জন্য Ψ পেতে পারি? একে বলে শোডিঙ্গারের সমীকরণ।

ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে নিউটনের সূত্রগুলো যেমন গুরুত্বপূর্ণ কোয়ান্টাম মেকানিক্সে শোডিঙ্গারের সমীকরণ তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। শোডিঙ্গারের সমীকরণ সমাধান করলে আমরা Ψ পাই। যদি কোনো নন-রিলেটেভিস্টিক কণার ভর m হয়, তার স্থিতিশক্তি $\mathrm{V}(x,t)$ হয় তাহলে x অক্ষ বরাবর শ্রোডিঙ্গারের সমীকরণ হবে,

$$\mathrm{i}\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar}{2\mathrm{m}} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \mathrm{V}\psi \qquad (2)$$

যেখানে $\hbar$ হচ্ছে সংশোধিত প্ল্যাংক ধ্রুবক। i হচ্ছে কাল্পনিক একক আর Ψ হচ্ছে ওয়েভ ফাংশন।

শ্রোডিঙ্গারের সমীকরণ সমাধান

$\Psi(x,t)$ হচ্ছে অবস্থান ও সময়ের উপর নির্ভরশীল। তাই এটি ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। অন্যদিকে x ও t হচ্ছে ইন্ডিপেনডেন্ট ভ্যারিয়েবল। শোডিঙ্গারের সমীকরণে $\frac{\partial \psi}{\partial t}$ ও $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$ বিদ্যমান। তাই এটি একটি পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। এই সমীকরণটি সেপারেশন অব ভ্যারিয়েবল মেথডে সলভ করা যাবে। এই পদ্ধতিতে $\Psi(x,\mathrm{t})$ কে x ও t এর দুইটি আলাদা আলাদা

ফাংশনের গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা যায়।

$$\psi(x,t) = X(x)T(t) = XT$$

সমাধানের সুবিধার্থে V কে টাইম ডিপেন্ডেন্ট বিবেচনা করি। অর্থাৎ V=V(x) তাহলে দুই নং সমীকরণ থেকে পাই,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}(XT)$$
$$= -\frac{\hbar}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}(XT) + VXT$$
$$i\hbar X\frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\hbar T}{2m}\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + VXT$$
$$\frac{i\hbar}{T}\frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\hbar}{2mX}\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + V \qquad (3)$$

এর মধ্যে বামপক্ষে থাকা রাশি সময়ের একটি ফাংশন। অন্যদিকে ডানপক্ষে থাকা রাখি সরণের একটি ফাংশন। যেহেতু বামপক্ষ ও ডানপক্ষ পরস্পর সমান তাই তারা অবশ্যই কোনো একটি ধ্রুবকের সমান হবে। এই ধ্রুবক E এবং একে এনার্জি আইগেন ভ্যালু বলে। এবার আমরা সমাধান শুরু করি -

$$\frac{i\hbar}{T}\frac{dT}{dt} = E$$
$$i\hbar \int \frac{dT}{T} = \int E\,dt$$
$$i\hbar \ln|T| = Et + A'$$
$$\ln|T| = \frac{Et}{i\hbar} + \frac{A'}{i\hbar}$$
$$\ln|T| = \ln e^{\frac{-iEt}{\hbar}} + \ln|A|$$
$$T = Ae^{\frac{-iEt}{\hbar}}$$

এটি একটি গেল। আবার

$$-\frac{\hbar}{2m}\frac{d^2X}{dx^2} + (V-E)X = 0$$

এটি শোডিঙ্গারের টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অথবা স্টেডি স্টেট রূপ। এটি সমাধানে প্রাপ্ত X এর মান $(V-E)$ এর উপর নির্ভরশীল। এই সমীকরণের প্রতিটি সমাধানের সাথে একটি করে নির্দিষ্ট মানের শক্তি সংশ্লিষ্ট থাকে। এই সংশ্লিষ্ট শক্তির মান E এর সমান। সুতরাং

$$\psi(x,t) = X(x)e^{\frac{-iEt}{\hbar}}$$

এখন সম্ভাবনা ঘনত্ব $|\psi(x,t)|^2 = \psi^*\psi$ [এখানে ψ^* হচ্ছে ψ এর জটিল অনুবন্ধী।] তাহলে

$$|\psi(x,t)|^2 = X^2 e^{\frac{-iEt}{\hbar}} e^{\frac{+iEt}{\hbar}} = X^2 = |\psi(x,0)|^2$$

অর্থাৎ যদি স্থিতিশক্তি সময়ের উপর নির্ভরশীল না হয়, তাহলে সম্ভাবনাও কোনো নির্দিষ্ট সমাধানের জন্য নির্ভরশীল হবে না। যেমন হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন স্টেডি স্টেট-এ থাকে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট শক্তির অরবিটাল থাকে। কিন্তু অন্যকোনো পরমাণুর সাথে বিক্রিয়ার সময় ইলেকট্রনের আকার বিকৃত হয়।

এত সমীকরণের পর আসেন মজা নেন !

কোয়ান্টাম সুপারপজিশন - একই সাথে একাধিক স্টেটে অবস্থান করার ক্ষমতা

"I think I can safely say that nobody really understands quantum mechanics"
~ Richard Feynman

meme_source - Unknown